পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতার রাজেরাজা

কলকাতার রাজকাহিনী

পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতার রাজকাহিনী

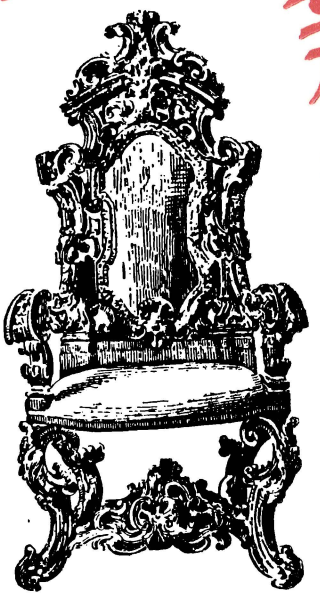

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৯ **দ্বিতীয় মুদ্রণ** অগাস্ট ১৯৮২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ পূর্ণেন্দু পত্রী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

অপু, রুপু, বাবলিকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

কি করে কলকাতা হলো
ছড়ার মোড়া কলকাতা

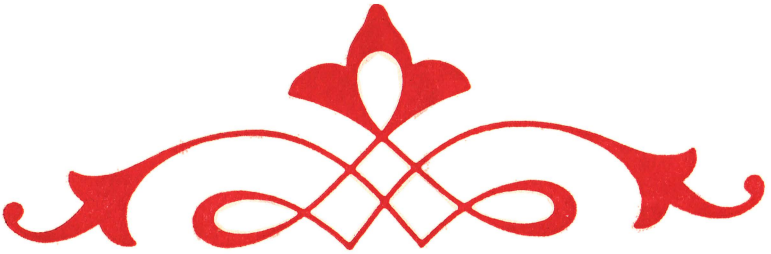

"পাখি উড়তে পারে এ তার একটি সম্পদ।...সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি'। এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক-এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়—কোনো কারণ নেই। সে নিজেকে বলে—'আমার গতিবেগ আমার সম্পদ—আমি পেয়েছি'। এই উৎসাহ ঘোষণা করেই তার উৎসব।... কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণসম্পদের চেয়ে বেশি-কিছু দিয়ে। যা সে সহজে পেয়েছে তাতে সে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা করে পেয়েছে তাতেই সে মানুষ।"

রবীন্দ্রনাথ

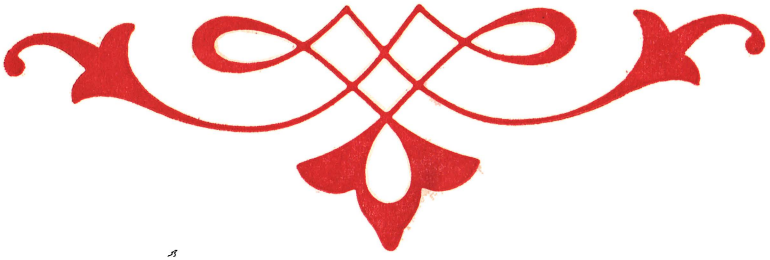

রাজা নবকৃষ্ণ দেব

রাজা নবকৃষ্ণ

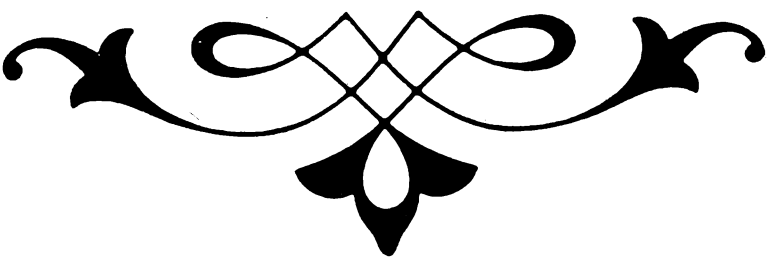

এই কলকাতা শহরে এক সময় অনেক রাজা ছিল, জান তো? তবে রূপকথার বইয়ে যে রকম সব রাজার গপ্পো থাকে, সে রকম নয়। তাঁদের সোনার সিংহাসন ছিল না বসবার। সোনার মুকুটও ছিল না পরবার। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সাতমহলা রাজপুরী, কিছুই ছিল না এসবের। সৈন্যসামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে তাঁরা না যেতেন শিকারে না যেতেন যুদ্ধে। অথচ রাজা।

কলকাতার যিনি প্রথম রাজা, তাঁর নাম ছিল নবকৃষ্ণ। দেখতে শুনতে সাদামাঠা মানুষ। মাথাটা একেবারে চেঁছে-পুছে কামানো। কেবল পিছন দিকে এক গোছা টিকি। ঠিক যেন মরুভূমির মধ্যে এক ঝাড় পান্থপাদপ। বেঁটেখাটো চেহারা। পরনে খাটো ধুতি। কাঁধে চাদর। খালি গা। রোজ গঙ্গাস্নানে যেতেন এই ভাবে। পিছন পিছন হাঁটতো প্রিয় চাকর কান্ত খানসামা। ছাতা দিয়ে প্রভুর মাথা বাঁচাতো।

তবে এই পোশাক পালটে যেত যখন যেতেন রাজদরবারে। এ রাজ-দরবার কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণের নিজের নয়। যে রাজার রাজত্বে বাস, তাদের। অর্থাৎ ইংরেজদের। তখন কলকাতায় ইংরেজদের রাজত্বি। ক্লাইভের আমল। ক্লাইভের ডাকেই রাজা নবকৃষ্ণকে যেতে হোতো রাজকাজে। তখন মাথায় পাগড়ী। পায়ে লপেটা জুতো। মেরজাই বা বেনিয়ানের উপর চাপকান। আর কেবল রাজদরবারে যাওয়ার সময়েই ঝালরঝোলানো পাল্কী। তখন ইংরেজ কোম্পানি বা ক্লাইভের অনুমতি না পেলে কারুরই ঝালর দেওয়া পাল্কী চড়ার হুকুম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর, ক্লাইভের হাতের মুঠোয় যখন কলকাতার রাজ্যপাট, তখন রাজা নবকৃষ্ণই একমাত্র বাঙালী, যিনি হুকুম পেয়ে-ছিলেন এই পাল্কী চড়ার।

রূপকথার রাজারা রাজা হয়েই জন্মায়। তাদের আর কষ্ট করে রাজা হতে হয় না। কিন্তু কলকাতার রাজাদের সকলকেই রাজা হতে হয়েছে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, রোদ-জল ঘেঁটে, মাথা ঘামিয়ে।

রাজা নবকৃষ্ণ তেমনি করেই রাজা হয়েছেন। খুব সাধারণ ঘরের ছেলে। বাবা রামচরণ দেবের গঙ্গার ধারে, গোবিন্দপুর গ্রামে বাস। নবাবের হেফাজতে চাকরী। হিজলী, তমলুক, মহিষাদল এই সব জায়গায় নিমক মহলের কর আদায় করার কাজ। রামচরণের আচার-আচরণ কাজ-কর্মে নবাব মহব্বত জঙ্গ ভারী খুশী। মানুষটা স্বভাবে খাটিয়ে। চরিত্রে খাঁটি। এঁকে তো তাহলে আরো উঁচু আসনে বসতে দিতে হয়। রামচরণকে তিনি করে দিলেন কটকের সুবেদারের দেওয়ান। কিন্তু এতটা উন্নতি সইবার মতো কপাল বুঝি ছিল না তাঁর। কটকে রওনা হওয়ার পথেই সুবেদারের দলকে আক্রমণ করল পিণ্ডারী দস্যুর দল। রামচরণ মারা গেলেন।

রামচরণের সংসার বলতে তখন তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে আর বিধবা স্ত্রী। সংসারে নেমে এল দুঃখের দিনের কালো মেঘ। রূপকথার গপ্পে দুয়োরানীর যেমন করে দিন কাটে ঘুঁটে কুড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, তেমনি করে বিধবার সংসার ভাসতে লাগল টলমল টলমল দুঃখ-কষ্টের ঢেউয়ে। ওদিকে ভাগীরথীর ঢেউও আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ধাক্কা মারতে লাগল বাড়ির দরজায়। তখন সে বাড়ি ছেড়ে আবার কোনমতে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই বানানো হল কাছাকাছি। কিন্তু সে বাড়ি তৈরী হতে না হতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা এসে জানালে, এখান থেকে

সবাইকে উঠে যেতে হবে। সে কি? উঠ্ বললেই ওঠা যায় নাকি? কোম্পানির লোকেরা বললে, অত শত বুঝি না। এখানে কেল্লা হবে। ফোর্ট উইলিয়ম। জায়গা দরকার। তবে ক্ষতিপূরণ পাবে, নগদ টাকা। আর জমির বদলে জমিও।

কোথায় জমি? আড়পুলীতে। না, সে জমি পছন্দ হল না। তাহলে ঘর তোলা হবে কোথায়? আবার চলো গঙ্গার কাছেই, এ জমি বেচে দিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে জায়গা পছন্দ হয়ে গেল শোভা-বাজারে। শুরু হয়ে গেল নতুন সংসার।

ঝড়ের রাতে মানুষ যেমন করে পিদিমের শিখাকে বাঁচায় দুহাতের আড়ালে, রামচরণের বিধবা স্ত্রী তেমনি করে বংশের কুলপ্রদীপদের বাঁচাতে লাগলেন স্নেহ-যত্নের আড়ালে রেখে। বড় ছেলে রামসুন্দর একটু বড় হয়েই হয়ে গেলেন পঞ্চকোটের দেওয়ান। মেজ ছেলে মানিকচন্দ্র একদিন পেয়ে গেলেন নবাবের দরবারে কাজ। দিল্লীর বাদশার নজর পড়ল তাঁর উপর। লাভ হল 'রায়' উপাধি। সেই সঙ্গে এক হাজারী মন্সবদারী।

এতদিনে সংসারের গায়ে পড়েছে সুখের আলো। মায়ের এখন ছোট ছেলে নবকৃষ্ণের দিকেই নজর। কি করে মানুষ করা যায়। বয়সে ছোট হলে কি হবে, ছেলেবেলা থেকেই নবকৃষ্ণ মেধায় বড়। দেখতে দেখতে যখন ষোলো বছর বয়স, তখন তিনি বাঙলা, ফারসী, উর্দু আর আরবী ভাষায় পটু। সেই সঙ্গে কাজ চালানোর মতো ইংরেজীও দখলে।

কলকাতার নতুন বাজারে থাকেন লক্ষ্মীকান্ত ধর। লোকে বলে নকু ধর। মানুষটার যেন টাকার পাহাড়ে বাস। নামেও লক্ষ্মী। ঘরেও লক্ষ্মী। ইংরেজ কোম্পানি তখন বিপদে-আপদে টাকা-পয়সা ধার করতো এই নকু ধরের কাছ থেকে। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে খুব মাখামাখি। নবকৃষ্ণ একদিন এই নকু ধরকে গিয়ে ধরলেন যেমন-তেমন একটা চাকরীর জন্যে। চাকরী জুটেও গেল কিছুদিনের মধ্যে। হেস্টিংসকে ফারসী ভাষা শেখানোর চাকরী। হেস্টিংস তখন

কোম্পানির একজন নামমাত্র কেরানী।

এর তিন বছর পরে হেস্টিংসকে চলে যেতে হলো কাশিমবাজার কুঠীতে। নবকৃষ্ণও চললেন সঙ্গে। কিন্তু বেশীদিন থাকতে হল না। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি লেগেই ছিল। একদিন রেগে লাল হ'য়ে সিরাজ লালমুখো সাহেবদের তাড়া করলেন কাশিমবাজার কুঠি থেকে। সেই সময় নবকৃষ্ণ পালিয়ে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে, নকু ধরের ব্যবসায় কিছুদিন কাজ করতে না করতেই হঠাৎ একদিন ডাক এলো ইংরেজ কোম্পানির দরবারে। কি ব্যাপার? না, একটা চিঠি পড়ে দিতে হবে। চিঠি? কোম্পানির নিজেরই তো লোক রয়েছে! মুন্সী তোজাউদ্দীন। না, তাকে দিয়ে এ চিঠি পড়ানো বা উত্তর লেখানো কোনটাই চলবে না। কারণ চিঠিটা পাঠিয়েছে রাজবল্লভ-মীরজাফরেরা। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চিঠি। মুসলমান মুন্সীকে দিয়ে পড়ালে গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

নবকৃষ্ণ পড়লেন। তার পরদিন থেকেই ৬০ টাকা মাইনের মুন্সি-গিরির চাকরী পাকা। লোকের মুখে নবকৃষ্ণের নতুন নামকরণ হল, নব মুন্সী।

এরপর ক্লাইভের নজর পড়ল তাঁর উপর। সিরাজউদ্দৌলা এসেছেন কলকাতা জয় করতে। হালসীবাগানে উমিচাঁদের বিরাট বাগানবাড়ি। সেইখানে নবাবের তাঁবু। ক্লাইভ বিপদ বুঝে সন্ধি করার জন্যে দূত পাঠালেন নবাবের কাছে। ওয়াল্‌শ আর স্ক্রাফ্‌টন। সঙ্গে নবকৃষ্ণ। হাতে নজরানা। নজর কিন্তু অন্য দিকে। তাঁবুর আশপাশে। ফিরে এসে নবকৃষ্ণ খবর দিলেন, যতটা ভয় দেখাচ্ছেন, নবাবকে অতটা ভয় করার কারণ নেই। তাঁর সৈন্যসংখ্যা এমন কিছু আহামরি নয়।

গভীর রাত। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত অন্ধকার দিয়ে মোড়া। মানুষজন, যে যেখানে সে সেখানে ঘুমে অচেতন। ঠিক সেই সময়ে, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে, নবাবী সৈন্যের তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্লাইভ। বলে নয়, বাজী মাৎ করলেন ছলে।

তারপর পলাশীর যুদ্ধ।

একটা পুরনো যুগের সূর্য অস্ত গেল যেন। তার শেষ লাল রশ্মিটুকু লালবাগের আমবাগানে ধুলোয় মাটিতে পড়ে রইল লাল রক্তের ফোঁটা হয়ে।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ।

ইংরেজ সেনাপতিরা চললেন নবাবের রাজকোষের দিকে। লুটের মাল ভাগ-বাটোয়ারা হবে। নবাবের রাজকোষ। মনি-মুক্তো হীরে-জহরতের না জানি কত ছড়াছড়ি। কিন্তু সিন্দুকের ডালা খুলে সকলেরই চোখ আকাশে। এ কি! এ তো একরকম ফাঁকা বললেই চলে। সব মিলিয়ে মাত্র দু কোটি টাকার মতো হবে হয়তো। এ যেন গোগ্রাসের বদলে গণ্ডুষ। যাই হোক্, রাজকোষের টাকা রাজ-পুরুষেরা যে যার ভাগ করে নিয়ে বিদায় হলেন।

মীরজাফর জানতেন সিরাজের গুপ্তধনের খবর। ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে গেলে, তিনি চুপি চুপি খুললেন সেই লুকনো কোষাগারের দরজা। সোনা রুপো হীরে জহরত মিলিয়ে প্রায় আট-কোটি টাকার মতো ধনরত্ন। ভাগ হল চারজনের মধ্যে। মীরজাফর আর তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর। আমীর বেগম খাঁ। দেওয়ান রামচাঁদ রায় আর মুন্সী নবকৃষ্ণ। রামচাঁদ রায় পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো হাতে পেয়ে গেলেন চাঁদের টুকরো সৌভাগ্য। আনন্দুলে ফিরে গিয়ে তিনি হাঁকালেন পাকা বাড়ি। নবকৃষ্ণ ফিরে এসেই গড়লেন ঠাকুর পুজোর দালান। দুর্গাপুজোর আর মোটে তিনমাস বাকী। যেমন করে হোক এরই মধ্যে নতুন চণ্ডীমণ্ডপ খাড়া করে আরাধনা করতে হবে দেবী দশভুজার। তাই হল।

কলকাতার মানুষ সেই প্রথম দেখল, হ্যাঁ পুজো কাকে বলে। ১৫ দিন ধরে উৎসব। একদিকে পুজো-আচ্চা, চণ্ডীপাঠ, ধূপ-ধুনো, ঢাক-ঢোল, ব্রাহ্মণ ভোজন, দরিদ্রদের জন্যে দানছত্র। আবার এরই উল্টোদিকে নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদের অথৈ আসর। মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী থেকে এসেছে বাঈজীরা। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ক্লাইভ পর্যন্ত ছুটে এসেছেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নাচ দেখতে, খানা খেতে।

কিছুকাল পরে ক্লাইভ চলে গেলেন স্বদেশে। পাঁচ বছর পরে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কারণ কলকাতায় তখন যে অরাজক অবস্থা, কঠোর ক্লাইভ ছাড়া সামলানো যাবে না। বিলেতের ডিরেক-টররা তাই আবার পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

ক্লাইভ কলকাতায় এসে যখন যে কাজ করেন, মুন্সী নবকৃষ্ণ সব সময়ে তাঁর সঙ্গে। দিল্লীর বাদশা শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দীনের সঙ্গে সন্ধি হবে। সন্ধির বয়ান লিখবে কে? নবকৃষ্ণ। দূত হয়ে নবাব দরবারে দাঁড়াবে কে? নবকৃষ্ণ। বেনারসের বলবন্ত সিং,

বিহারের সেতাব রায় এদের সঙ্গে কোম্পানির বোঝাপড়া পাকাপাকি করবে কে? নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ এতদিনে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান। বাদশাকে বছরে খাজনা দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা। মুর্শিদাবাদের নবাব শুধু নাম কা ওয়াস্তে সুবেদার।

কলকাতার নবাব হয়ে ক্লাইভের প্রথম মনে পড়ল নবকৃষ্ণের কথা। লোকটা ইংরেজদের জন্যে কী না করেছে। তার জন্যে ইংরেজদের এবার কিছু করা উচিত।

কলকাতার মানুষ একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খবর পেল, মুন্সী নবকৃষ্ণ চলেছেন রাজা হতে। হ্যাঁ। রাজাবাহাদুর। ক্লাইভ তাঁর জন্যে দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন এই উপাধি, আর পাঁচ হাজারী মনসবদারী। সেই সঙ্গে পেয়েছেন ঝালরদার পাল্কী আর নাকাড়া ব্যবহারের অধিকার। তাঁর অধিকারে ৩০০০ অশ্বারোহী।

বছর পোয়াতে না পোয়াতেই আবার আর এক কাণ্ড। রাজা থেকে মহারাজা। এবার ছ হাজারী মনসবদারী। ৪০০০ অশ্বারোহী রাখারও অধিকার সেই সঙ্গে।

ক্লাইভ ডাকলেন দরবার। উপাধি বিতরণের উৎসব। কলকাতার যেখানে যত ইংরেজ সবাই সেদিন হাজির। ক্লাইভ নিজের হাতে উপহার তুলে দিলেন একে একে। প্রথমে ফারসী ভাষায় নাম খোদাই করা সোনার পদক। তারপর দামী দামী পোশাক-আশাক। তারপর হস্তী, অশ্ব, তরবারি, ঢাল, চামর, শিরপ্যাঁচ, ছত্র, ঝালরদার পাল্কী, ঘড়ি, কুণ্ডল, হীরে, মুক্তো, রত্নখচিত অলঙ্কার।

দরবার যখন শেষ, ক্লাইভ নিজে হাত ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলেন ঝলমলে পোশাকে সাজানো হাতির উপরে, রুপোর ঝিকমিকে হাওদায়। যেন বর চলেছে বিয়ে করতে। বাজছে কাড়া-নাকাড়া। তার সঙ্গে বিলেতী বাজনাও। সামনে পিছনে অশ্বারোহী, পদাতিক আসাসোঁটা বরদার মিলিয়ে এমনি কত। শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে ইংরেজ পাড়া থেকে শোভাবাজারের দিকে। সেদিন গোটা শহরটা যেন ঘর ছেড়ে

পথে। পথ-ঘাট যেন মানুষের সমুদ্দুর। কলকাতার মানুষ সেদিন একটা চোখ-জুড়িয়ে দেখবার মত দৃশ্য পেয়ে আত্মহারা।

এরপর ক্লাইভ নবকৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিলেন রাজত্ব চালানোর অনেক দায়-দায়িত্ব। আগে ছিল মুন্সীদপ্তর। সেটা হল ফারসি ভাষা বিভাগের সেক্রেটারীর আপিসে। এবার চাপলো আরও পাঁচটা দপ্তরের ভার। আরজবেগী দপ্তর। যেখানে নেওয়া হয় বিভিন্ন রকমের আবেদন। জাতিমালা কাছারি। যেখানে বিচার করা হয় জাত-পাতের অভিযোগের। খাজনাখানা। যেখানে জমা হয় কোম্পানির টাকা। মাল আদালত। ২৪ পরগনার রাজস্ব নিয়ে গোলমালের বিচার হয় যেখানে। তহশীল দপ্তর। ২৪ পরগনার কলেক্‌টারী আপিস।

রাজা থেকে মহারাজা। যত মান বাড়ে, তত দানও বাড়ে নবকৃষ্ণর। মায়ের শ্রাদ্ধ। সে এক এলাহি কাণ্ড। গোড়ায় ঠিক ছিল, খরচ করা হবে ন' লক্ষ টাকা। কিন্তু শ্রাদ্ধ যত গড়ায়, দেখা যায় খরচ লক্ষ্যহীন। শোভাবাজার ভরে গেছে গরীব দুঃখী কাঙালী মানুষে। বাজারে আর কেনার মতো চাল-ডাল নেই। কলাপাতাও উধাও।

মায়ের শ্রাদ্ধের পর মেয়ের বিয়ে। মেয়ের বিয়ে গেলো তো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। তারপর তো রয়েছে বছর বছরের দুর্গাপুজো। আর রয়েছে সারা বছর ধরে বাড়িতে গান-বাজনার আসর। তখন যাঁরা সব সেরা গাইয়ে, যেমন নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রাজবাড়িতে তো এঁদের নিত্য আনাগোনা।

নবকৃষ্ণ যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর সাত মহলে সাতটি স্ত্রী। কিছুতেই সন্তানের আলোয় সংসার আলো হচ্ছে না বলেই সাত সাতবার বিয়ে। শেষে এমন অবস্থা বুঝি নিঃসন্তান হয়ে মারা যেতে হয়। সেই ভয়েই নিজের বড় ভাই রামসুন্দরের ছেলে গোপীমোহনকে নিয়েছিলেন দত্তক। দত্তক নেওয়ার অনেকদিন পরে দেখতে পেলেন নিজের ছেলের চাঁদমুখ। প্রথম সন্তান জন্মাল চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে। এই আনন্দে প্রজা-পাঠকদের বাকী খাজনা মকুব। ছেলে বলতে ঐ একজনই। রাজকৃষ্ণ। তিনজন মেয়ে রাজকৃষ্ণের পরে পরে। আর এক মেয়ে পেলেন প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে। মারা যাওয়ার দু'বছর আগে মুখ দেখলেন নাতিরও। গোপীমোহনের ছেলে রাধাকান্ত। এঁরাও রাজা হয়েছেন একে একে। রাজকৃষ্ণ যখন মায়ের কোলের শিশু, নবকৃষ্ণ তখনই দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন 'রাজা বাহাদুর' খেতাব।

রাধাকান্তও রাজা হয়েছিলেন বটে, তবে সেটা নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে, দাদুর দাপটের জোরে নয়। রাধাকান্ত তাঁর সময়ে নেতা ছিলেন রক্ষণশীলদের। তবু সমাজের অদল-বদলে তাঁর অবদান ছিল অনেকখানিই। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, ৪০ বছরের প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়ে তোলা ৮ খণ্ডের 'শব্দকল্পদ্রুম'। সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান আর কৃতিত্বের জন্যেই ইংরেজ সরকার তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল 'রাজা বাহাদুর' উপাধির মুকুট পরিয়ে।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন

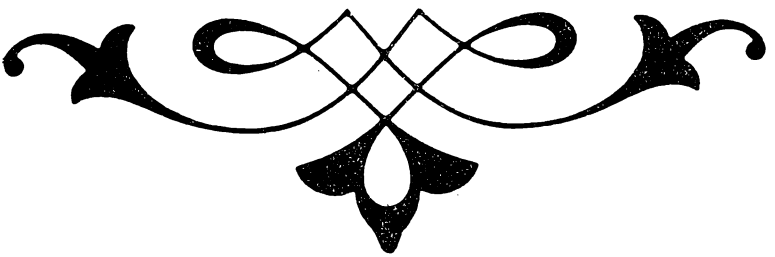

রাজা বলতে কলকাতায় তখন এক-আধ জন নয়, অগুনতি। সকলের কথা লিখতে গেলে, সাতকাণ্ড মহাভারত। অনেক রাজা সাজে রাজা, অনেক রাজা কাজে রাজা। কাজের রাজা তাঁরাই, যাঁরা তাঁদের নিজের সময়ের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির তুমুল-ঢেউ-তোলা অনেক বড় বড় আলোড়নের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছিলেন নিজেদের।

যেমন ধরো মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বাংলা নাটকের জন্যে এঁর ছিল দিন-রাতের তপস্যা। যতীন্দ্রমোহন পাথুরেঘাটার রাজা। নাটকের ব্যাপারে সঙ্গী পেলেন আর দুই উৎসাহী রাজাকে। পাইক-পাড়া রাজবাড়ির দুই ভাই, প্রতাপচন্দ্র আর ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। তিনজনে হাতে হাত লাগিয়ে গড়ে তুললেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে একজন বাঙালী খৃশ্চান, কলকাতার পুলিশ আদালতে দোভাষীর কাজ করে পেট চলে যাঁর, তিনিই যে

একই সঙ্গে বাংলার নাটকের জগতে আর কবিতার জগতে বইয়ে দিলেন নতুন সৃষ্টির জোয়ার আর আবিষ্কার করলেন 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রাণবন্ত লাবণ্য, সেটার পিছনে বেলগাছিয়া নাট্যশালা আর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অবদানই সবচেয়ে বেশী। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তর্ক করে এবং বাজী রেখে তিনি হাত দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কারে। 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' যেদিন যতীন্দ্রমোহনের টাকায় বই হয়ে ছাপা হল, দেখা গেল মধুসূদন সে বই উৎসর্গ করেছেন যতীন্দ্রমোহনকেই। মধুসূদনের জীবনে বন্ধুর মত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আরও এক রাজা। তিনি দিগম্বর মিত্র।

যতীন্দ্রমোহনের যেমন যত টান নাটক বা সংস্কৃতির দিকে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তেমনি ছিল পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাসের দিকে। তাঁর কাগজ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছিল সেকালের এক সেরা পত্রিকা। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে বলা যেতে পারে বাংলার নবজাগরণের সময়কার একজন স্বাধীনচেতা নেতা।

এমনি অনেক রাজা জড়িয়ে আছেন আমাদের দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির উত্থান-পতন আর অভ্যুদয়ের সঙ্গে। তবে রাজার রাজা বলতে গেলে একজনই। তিনি রাজা রামমোহন। এঁরই হাত ধরে কলকাতায় এগিয়ে এসেছিল নতুন কালের হাওয়া। তাঁরই আমলে তুমুল লড়াই ঝমঝমিয়ে বেজে উঠেছিল, যাবতীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে।

হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের লাগোয়া একটা গ্রাম। নাম রাধানগর। রামমোহন সেই গ্রামেরই ছেলে। বংশের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের শাঁকাসা গ্রামে। বংশের আদি পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মুর্শিদাবাদ নবাবের তহশীলদার। উপাধি পেয়েছিলেন রায়। রাজকর আদায় করতে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে চোখে ভাল লেগেছিল খানাকুল-কৃষ্ণনগরের প্রাকৃতিক শোভা। আকাশ মাটি গাছপালা নদী নালা সব মিলেমিশে মন কেড়েছিল তাঁর। বৃদ্ধ বয়সে ঐখানেই গড়লেন বসতবাটি। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন ছেলে। অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ আর ব্রজবিনোদ।

এই ব্রজবিনোদ যখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে নিয়ে আসা হল ভাগীরথীর তীরে। তখন এই রকম রেওয়াজ ছিল। মৃত্যুর দিকে যাঁর পা বাড়ানো, তাঁর পা ছুঁইয়ে রাখা হত গঙ্গাজলে। একে বলা হত

'গঙ্গাজলী'। সেই সময়ে কাছাকাছি চাতরা থেকে শ্যাম ভট্টাচার্য এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। দু'হাতে নমস্কার। দু'চোখে মিনতি। কি চাই? আজ্ঞে চাই একটা প্রতিশ্রুতি। কিসের? আমার একটা বিনীত প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে আপনাকে। কি প্রার্থনা? আপনার তো সাত ছেলে। তাদের যে কোন একজনের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিয়ে দেন।

ব্রজবিনোদ সাত ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। কে রাজী আছ? একে একে ছয় ছেলে এক বাক্যে জানিয়ে দিলে তারা কেউ রাজী নয়। কারণ তারা বৈষ্ণব। শ্যাম ভট্টাচার্য্যিরা শাক্ত। কুল-ধর্মে জল ঢালতে কেউ রাজী নয় তারা। শ্যাম ভট্টাচার্যের মন বিষাদে কালো, সেই সময় এগিয়ে এলো ছোট ছেলে রামকান্ত। বিয়ে হয়ে গেল। কন্যার নাম তারিণী। ডাক নাম ফুল ঠাকুরানী। রামকান্তের এক মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়ে বড়। বড় ছেলের নাম জগন্মোহন। ছোট রামমোহন।

রামমোহন যখন নিতান্ত দুধের বালক সেই সময় মায়ের সঙ্গে এসেছেন দাদুর বাড়িতে। দাদু একদিন পুজোআচ্চা শেষ করে নাতির হাতে দিয়েছেন পুজোর প্রসাদ খেতে। তার মধ্যে ছিল বেল পাতা। বালক রামমোহন প্রসাদের সঙ্গে বেলপাতাও চিবিয়ে খাচ্ছে দেখে তারিণীদেবী ছুটে এসে মুখ থেকে কেড়ে নিলেন সেই পাতা। ফেলে দিলেন দূরে ছুঁড়ে, আর বকাবকি করলেন বাবাকে। ঐটুকু দুধের ছেলেকে কেউ বেলপাতা দেয় খেতে? শ্যাম ভট্টাচার্য শাক্ত। রাগ জ্বলে উঠল নিমেষে চোখে মুখে। তিনি অভিশাপ দিলেন, যে-ছেলের জন্যে তোর এত গর্ব, সে একদিন বিধর্মী হবে। অভিশাপ শুনে মেয়ে লুটিয়ে পড়ল বাপের পায়ের নীচে, মাটিতে। বাবার চোখেও তখন অনুতাপের জল। তিনি বললেন, বিধর্মী হবে ঠিকই, তবে বিখ্যাতও হবে বিশ্বভুবনে।

রামমোহনের লেখাপড়া শুরু হল গাঁয়ের পাঠশালায়। ইয়া বড় মাথা। মাথা-ভর্তি বুদ্ধি। যেই না ন' বছর বয়সে পা, রামকান্ত ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন পাটনায়। আরবী আর ফারসীতে পাকাপোক্ত

না হলে রাজকাজ জোটে না। আর ঐ দুটো ভাষা শেখার ব্যবস্থা পাটনাতেই ভাল। তিন বছর ধরে পাটনায় চলল আরবী ফারসী শেখা। এরই মধ্যে পৃথিবীর সব দিকপাল লেখক যেমন ইউক্লিড, এ্যারিস্টটল, এঁদের বই পড়া শেষ। কোরাণ কণ্ঠস্থ। এদিকে রামায়ণ তো জিভের ডগায়। রোজ ভাগবত পাঠ না করে জল খান না। যখন ১২ বছর বয়েস, তখন রামমোহনকে কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল সংস্কৃত শিখতে। সেখানে গিয়ে উপনিষদে হাতে খড়ি। সেইখানেই চোখে পড়ল এক মন্ত্র, একমেবাদ্বিতীয়ম্। কাশী থেকে ফিরেই লাগল বাপ আর ছেলের তর্কযুদ্ধ। বাবা গোঁড়া হিন্দু। ছেলে হিন্দু ধর্মের পুতুল পুজোর ঘোর বিরুদ্ধে। ১৬ বছর বয়সেই রামমোহন লিখে বসলেন একটা বই। হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। রামকান্ত এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে তাড়িয়ে দিলেন ছেলেকে বাড়ি থেকে।

রামমোহন ভ্রূক্ষেপহীন। ঘর হারালেন বটে কিন্তু বিশ্বাস হারালেন না নিজের ধ্যান-ধারণার উপর। এখন বিশ্বাসের গাছটাকে শক্ত-সমর্থ করে তুলতে হবে, আলোয়-জলে, সারে-মাটিতে। পৃথিবীর দশ দিকের কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা দিলেন হিমালয়ের দিকে মুখ করে। সেখান থেকে তিব্বত। তখন সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল হিমালয়ের পরেই পৃথিবী শেষ। তিব্বতে গিয়ে চলল বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ। কিন্তু বিপদ সেখানেও কম নয়। তিব্বতীরা যখন শুনলে রামমোহন বৌদ্ধধর্মের দোষ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, শুরু হয়ে গেল নানান রকম অত্যাচার। বেশী বকলে মেরেও ফেলা হবে প্রাণে। তবু রামমোহন যে মরলেন না, সে হোল তিব্বতী মেয়েদের মমতায়। সেই থেকে রামমোহনের বুকের মধ্যে নারী জাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আর সচেতনতা।

ওদিকে রামকান্ত ব্যস্ত। রামমোহন কোথায় গেছে ফিরিয়ে আনো। আহা, ঐটুকু ছেলে। কোথায় ঘুরছে অনাদরে, অনাহারে। ১৬ বছরের ছেলে ঘরছাড়া হয়ে ঘরে ফিরে এল ২০ বছর বয়সে। হারানিধি ফিরে পেয়ে সারা বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। ক'দিন যেতে না যেতেই বেজে উঠল বিয়ের সানাই।

বিয়ে কিন্তু রামমোহনের একটা নয়। তিনটে। প্রথম স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সে। তারপর বর্ধমানের মেয়ে। তারপর ভবানীপুরের মেয়ে উমা দেবী। বিয়ের পর আবার সেই একই ইতিহাস। ধর্ম নিয়ে

বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি। আবার তিনি ছেলেকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। কিছুকাল পরে মারা গেলেন রামকান্ত। বিষয়-সম্পত্তি তার আগেই ভাগ করা, তিন সন্তানের নামে। ফুল ঠাকুরানী রাম-মোহনকে দেখেন বিষ-নজরে। তিনি ছেলের নামে মামলা জুড়ে দিলেন সুপ্রীম কোর্টে। পাছে বিধর্মী ছেলে বাপের বিষয় পায়। মামলায় রামমোহনই জিতলেন। জিতলে হবে কি, মায়ের নির্যাতন, পাড়া-পড়শীদের উৎপাত, অভদ্র আচরণ, অত্যাচার প্রতিদিন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাড়া করে চলল তাঁর পিছনে। রামমোহন কিন্তু নির্বিকার। মায়ের জমিদারীর এলাকা ছাড়িয়ে রঘুনাথপুরের শ্মশানের উপর বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়ির সামনে মণ্ড। তার গায়ে লেখা 'ওঁ তৎসৎ' আর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ইতিমধ্যে সরকারী চাকরীতে উন্নতি করেছেন অনেক। যে ইংরেজী ভাষা আগে একেবারেই জানতেন না, এখন সে ইংরেজীতেও দক্ষ। বিয়ে দিয়েছেন বড় ছেলে রাধাপ্রসাদের। বয়স হয়ে গেছে ৪২। এই সময়ে চলে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে জড়িয়ে পড়লেন সমাজ বদলানোর বড় বড় কাজে। প্রথমেই গড়লেন 'আত্মীয় সভা' নামে একটা প্রতিষ্ঠান। এখানে আলোচনা হতো নিরাকার ঈশ্বর নিয়ে। কলকাতার যাঁরা খাঁটি হিন্দু, তাঁরা এই আত্মীয় সভার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। একদিন শুরু হয়ে গেল তর্কযুদ্ধ মহাসভা ডেকে। রাজা রাধাকান্তদেব কলকাতার বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের নিয়ে সদলবলে হাজির। সভা যখন শেষ, তখন দেখা গেল বিপক্ষদলের সেরা পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর ঘাড় মাটির দিকে নামানো।

এরপর রামমোহন গড়লেন ব্রাহ্মসমাজ। ওদিকে চলছে সতী-দাহ প্রথাটাকে চিরকালের জন্যে তুলে দেবার আন্দোলন। সতীদাহ, বহু বিবাহ, বাঙালী সমাজের যেখানে যত অন্যায়, রামমোহন সবেরই বিরুদ্ধে। তবু বিশেষ করে সতীদাহ-টাকে বন্ধ করার জন্যে যে উঠে-পড়ে লাগা তার কারণ ছিল। নিজের বৌদিকে তিনি পুড়ে মরতে দেখেছিলেন চোখের সামনে। সেইদিন থেকে প্রতিজ্ঞা। একে বন্ধ

করবোই। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যেও আগ্রহ উদ্যমের অন্ত নেই। ইংরেজী ভাষায় লোকে লেখাপড়া শিখবে, এটাও ছিল তাঁর গভীর ইচ্ছে।

নিজের প্রাণপণ চেষ্টায় দীর্ঘদিনের সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন জয়ী হলেন রামমোহন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক-এর আমলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গেল আইন করে। কলকাতায় একদিকে চলল তুমুল আনন্দ উৎসব। আরেক দিকে চলল নিন্দা আর সমালোচনার কাদা ছিটানো। সেই সঙ্গে ছড়া, কবিতা, গান লিখে রামমোহনকে ধিক্কার। তার মধ্যে একটা গান ছিল—

সুরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ি খানাকুল
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
বানিয়েছে ইস্কুল।

এর এক বছর পরেই পা বাড়ালেন বিলেতের দিকে। তার আগেই তাঁর মাথায় দিল্লীর বাদশা পরিয়ে দিলেন 'রাজা' উপাধির মুকুট। রামমোহনের মনে ইচ্ছেটা ছিল অনেকদিনের। বিলেত যাবেন, সে দেশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্মচিন্তা, রাজনীতির ধারণা—এ সব বিষয়ে জানতে-বুঝতে। এই ইচ্ছের কথা শুনেই, চিন্তার দিক থেকে যাঁরা সেকেলে, তাঁরা জ্বলে উঠেছিলেন তেলে-বেগুনে। ছিঃ ছিঃ! হিন্দুর ছেলে যাবে ম্লেচ্ছদের দেশে! এখন আমাদের কাছে অন্য দেশে যাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। ডাল-ভাতের মত সহজ। যেতে পারাটা কৃতিত্বেরই ব্যাপার। তাহলে ভেবে দেখো কী সংস্কারময় অবস্থাটা ছিল তখন দেশের। যেন কালোয় কালোময়।

রামমোহনের বিলেত যাওয়ার বাসনা পূরিয়ে দিলেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ আকবর। ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে তাঁর ছিল কিছু অভিযোগ জানানোর। ইংরেজরা বছরে বছরে যে টাকা বৃত্তি দেবে বলেছিল, দিচ্ছে না। তারই প্রতিকারের জন্যে লোক পাঠানো।

বিলেতে যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গী হলেন পালিত পুত্র রাজারাম। আর দুই বন্ধু। আর ছিল দুটি গাইগরু। জাহাজের নাম 'আল-বিয়ান'। ৪ মাস ২৩ দিন সমুদ্র সাঁতার দিয়ে আলবিয়ান এসে থামল লিভারপুলে। তারপর শুধু জনসভা, আর প্রশংসা আর নিমন্ত্রণ। লিভারপুল থেকে লণ্ডন। সেখানেও সম্মানের ছড়াছড়ি। যেন

ইংল্যাণ্ড জয় করতে এসেছেন কোন দিগ্বিজয়ী রাজা। ইংলণ্ডের রাজা প্রকাশ্য ভোজসভায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে স্বীকার করে নিলেন তাঁর 'রাজা' উপাধি।

লণ্ডন থেকে ফ্রান্স। সেখানেও একই দৃশ্য। একই রকম সমাদর জানানোর ঘটা। ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপের সঙ্গে ভোজ।

ফ্রান্সে মাত্র এক বছর। তাতেই ফরাসী ভাষা শিখে নিলেন সহজে। ফ্রান্স থেকে যখন আবার ফিরে এলেন ইংলণ্ডে, তখন শরীর গেছে ভেঙে। হঠাৎ একদিন জ্বর দেখা দিল গায়ে। জ্বর থেকে হয়ে গেল ধনুষ্টঙ্কার। হাজার চিকিৎসাতেও বাঁচানো গেল না। ব্রিস্টল শহরের স্টেপল্‌টন্‌ গ্রোভ-এর কাছাকাছি খৃষ্টানদের সমাধির জায়গায় তাঁর দেহকে সমাধি দেওয়া হল। পরে এই সমাধি সরিয়ে নেওয়া হয় আরনোস্‌ ভেল-এ। সেটা করেন প্রিয় বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, নিজের বিলেত ভ্রমণের সময়। রামমোহন যেন জন্মেছিলেন রাজা হবার জন্যেই। চেহারাতেও রাজা। চরিত্রেও রাজা। লম্বায় ছ' ফুট। আর যেমন দৈর্ঘ্য তেমনি প্রস্থ। রামমোহন মাথায় যে পাগড়ীটা পরতেন সেটা তাঁর মৃত্যুর পর রয়ে গিয়েছিল ব্রিস্টলেই। যে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন তাঁর কাছে। প্রায় ৬০ বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী যখন বিলেতে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন সেটা। তখন দেখা গেল, কলকাতা শহরে এমন কোনো জোয়ান নেই, যার মাথায় ঐ পাগড়ীটা আঁটবে।

শরীরটা ছিল পুরনোকালের অট্টালিকার স্তম্ভ। জীবনটা ছিল নিয়মে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠতেন রাত চারটেয়। এক কাপ কফি খেয়ে বেড়ানো। ফিরে এসে চা। তারপর ব্যায়াম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নান। দুজন পালোয়ান স্নানের আগে সরষের তেল দিয়ে দলাই-মলাই করতো ঘণ্টাখানেক। খেতে বসতেন যখন, তখন কেউ একজন পড়ে শোনাতো খবরের কাগজ। খাবার পর টেবিলের উপরে শুয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর কাজকর্ম। বিকেল তিনটেয় জলযোগ।

পাঁচটায় খেতেন ফলমূল। রাতের খাওয়া দশটায়। তারপর অনেকক্ষণ গল্পগুজব। তিনি নিজেও জানতেন, পাহাড়ের মত শরীর তাঁর। কেউ এসে যখন খবর দিত, আপনাকে অমুকরা মারবে, তিনি বলতেন—তাই নাকি? আমাকে মারবে এমন ক্ষমতা আছে তাদের? যখন বাইরে বেরোতেন, বুকের মধ্যে গোপনে লুকনো থাকতো একটা ধারালো ছোরা। আর হাতে এমন লাঠি, যার ভিতরে আঁটা আছে তরোয়াল। এমন শক্ত-সবল মানুষটার ভিতরেও কিন্তু বাস করতো এক সরল শিশু। ছোটদের সঙ্গে মনের সুখে বাগানের গাছে টাঙানো দোলনায় দুলতে পারতেন সেই কারণে।

সবচেয়ে মজার হলো তাঁর খাওয়ার গপ্পো। রোজ দুধ খেতেন বারো সের। পাঁঠা খেতেন একটা গোটা। এক সঙ্গে আম খেতেন পঞ্চাশটা। একবার নিজের জন্মভূমি খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গেছেন বেড়াতে, মোক্তার বন্ধু গুরুদাস বসুর বাড়িতে। বাগানে সার সার নারকেল গাছ। রামমোহন বললেন, ডাব খাওয়া যাক, কি বল? গুরুদাস তখুনি একটা ডাব পাড়িয়ে খেতে দিলেন। তা দেখে রাম-মোহনের হাসি আর ধরে না।

'ও গুরুদাস, ওতে আমার কি হবে। কাঁদি সুদ্ধ নারকেল পেড়ে ফেল।'

কেউ এসে যখন তাঁকে বলতো, অমুক লোক আপনার সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামতে চায়। শুনে রামমোহন বলতেন, আরে, ও কি খায় যে আমার সঙ্গে তর্ক করবে?

ঐ রকম বিশালকায় মানুষ, বাঘের মতো যার মাথা, বৃষের মতো কাঁধ, সিংহের মতো কটি, সেই মানুষ কিন্তু তর্কের সময় পাখির মতো মিষ্টভাষী আবার শোকে-তাপে-সংকটে গাছের মতো স্থির। এই নিয়ে একটা গল্প আছে। কলকাতার সান্‌কি ডাঙার ভবানীচরণ দত্ত আর কলুটোলার নীলমণি কেরানী এঁরা দুজনেই রাজা রামমোহনের চেনাজানা মানুষ। এঁদের মাথায় একদিন প্রশ্ন জাগল, আচ্ছা! রাম-মোহন কতখানি বেহ্মজ্ঞানী সেটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হতো। শোকে-তাপে কী সত্যিই লোকটা অটল থাকে? শুরু হল পরীক্ষার পালা। রামমোহনের ছেলে রাধাপ্রসাদ তখন কাজ করেন কৃষ্ণনগরে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে একটা মিথ্যে চিঠি লিখে সেই চিঠিটা একজন হরকরাকে দিয়ে পাঠানো হল রামমোহনের কাছে। চিঠিটা যখন তাঁর হাতে পেঁছিল, ভবানীচরণ আর নীলমণি দুজনেই পাশে

বসে, তাঁরা দেখলেন, চিঠিটা পড়ে মাত্র মিনিট পাঁচেক চুপচাপ হয়ে গেলেন তিনি। মুখে নেমে এল সন্ধের ম্লান অন্ধকার। কিন্তু তার-পরেই তিনি আগের মত ডুবে গেলেন নিজের কাজে।

রামমোহনের বাড়ির সামনের বাগান থেকে এক ব্রাহ্মণ রোজ ফুল পাড়তো গাছে উঠে। একদিন হয়েছিল কি, বাড়ির কে একজন দুষ্টুমি করে তাঁর উত্তরীয়টা তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ গাছ থেকে নেমে উত্তরীয় না দেখতে পেয়ে পাড়া মাৎ করলেন চেঁচিয়ে। চীৎকার শুনে রামমোহন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—কি হয়েছে, দেবতা?

রামমোহন ব্রাহ্মণদের দেবতা বলে ডাকতেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমার উত্তরীয় কে চুরি করেছে।

—ঠিক আছে। চেঁচাবেন না। পেয়ে যাবেন।

উত্তরীয় চলে এল। ফিরিয়ে দেবার সময় রামমোহন বললেন, এবার সন্তুষ্ট তো?

ব্রাহ্মণ বললেন, এতে সন্তুষ্ট হবার কি আছে। আমার জিনিস আমিই পেলাম।

রামমোহন তখুনি তাঁকে শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন—

—আপনার হাতে কি?

—পুষ্প।

—কার পুষ্প? কে দিয়েছে?

—দেবতা।

—কাকে দেবেন?

—দেবতাকে।

—তাহলে আর কি লাভ হল। দেবতার জিনিসই তো দেবতাকে দিলেন।

ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

শুধু ঐ ব্রাহ্মণ নয়, যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের সকলকেই মাথা হেঁট করতে হয়েছে একে একে। এখন তিনি নেই। এখনো সারা দেশের মাথা তাঁর দিকে নত।

রাজকুমার দ্বারকানাথ

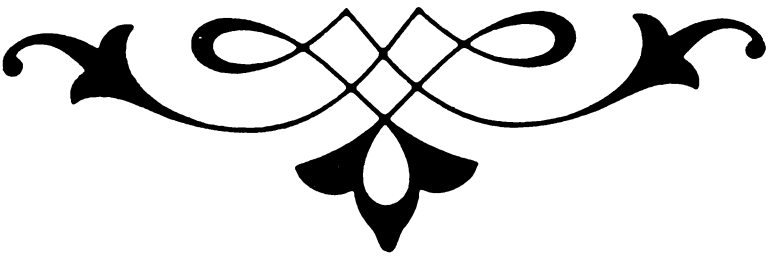

রাজার গল্প হলো অনেক। এবার এক রাজকুমারের গল্প। এই রাজকুমারের না ছিল পক্ষীরাজ, না খাপ-খোলা তলোয়ার, না লাল কমল, না নীল কমল। থাকবেই বা কি করে? আসলে তো রাজ-বাড়ির ছেলেই নন। জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। সেখানে কি রাজবাড়ি ছিল কোনদিন? মোটেই না। তবুও তিনি রাজকুমার। মানুষের দেওয়া ভালবাসার নাম প্রিন্স। গল্পটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি।

জয়রাম ঠাকুরের চার ছেলে। আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ, আর গোবিন্দরাম। এক মেয়ে। সিদ্ধেশ্বরী। নীলমণির সঙ্গে যে ভায়ের গলায় গলায় ভাব, তিনি হলেন দর্পনারায়ণ। দুই ভাই এক সঙ্গে থাকেন পাথুরেঘাটার বাড়িতে। নীলমণিই বাড়ির কর্তা। যদিও বছরের বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটে তাঁর। সরকারী চাকরী। ওড়িশার কালেকটরের সেরেস্তাদার। তখন লর্ড ক্লাইভের

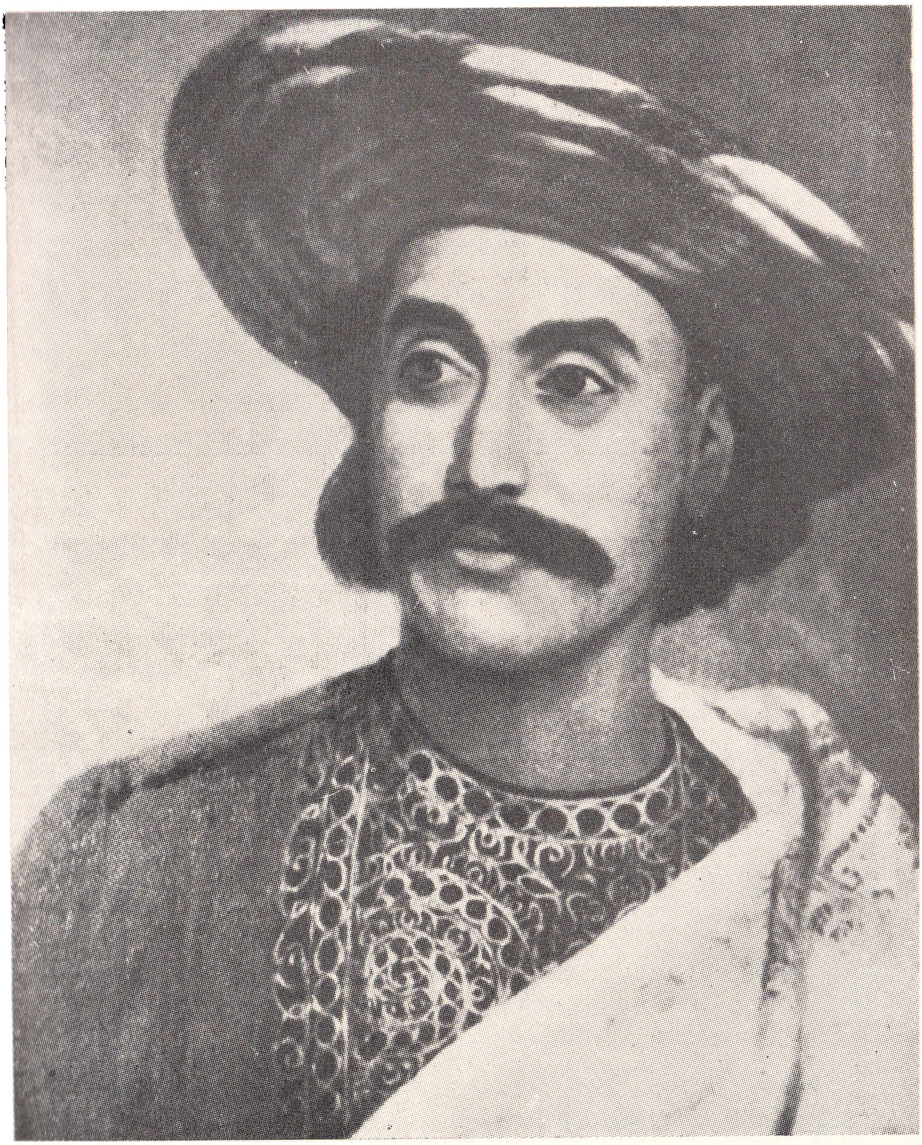

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

আমল। ইংরেজরা সদ্য বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানি পেয়েছে। নীলমণি যা রোজগার করেন, নিজের খাওয়া-পরার খরচটুকু বাদ দিয়ে বাকি সব টাকা পাঠিয়ে দেন ভাই দর্পনারায়ণের কাছে। এমনি করে দিন যায়। বছর যায়। একদিন চাকরী থেকে অবসর নেবার সময় হল নীলমণির। তিনি চলে এলেন ভাই দর্পনারায়ণের কাছে। বাকি জীবনটা এখানেই কাটাবেন সুখে শান্তিতে। কিন্তু সে আর হল না। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ঘূর্ণি-ঝড়ে যেমন মাটির ধুলো আকাশের দিকে উঁচু হয়ে ওঠে, পাথুরেঘাটার সংসারে তেমনি উঁচু হয়ে উঠল দুই ভায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ। উপলক্ষ নীলমণি মাসে মাসে যে মোটা টাকা পাঠাতেন, তার হিসেব। শেষ পর্যন্ত নানা জনের মধ্যস্থতায় রফা হল দু-ভায়ের মধ্যে। নীলমণি পাথুরেঘাটার বাড়ি ছাড়বেন। তার বদলে পাবেন নগদ এক লক্ষ টাকা।

সেদিন আকাশ ঝাঁপিয়ে ঝড়-বাদল। আর সেই দুর্যোগের মধ্যে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের হাত ধরে ঘর-ছাড়া হলেন নীলমণি। কাছেই জোড়াবাগান। সেখানে থাকতেন এক ব্যবসায়ী। নাম বৈষ্ণবচরণ শেঠ। গঙ্গাজল বেচার ব্যবসা। তাতে নামও যত, পয়সাও তত। নিজে গোঁড়া হিন্দু। গঙ্গাজলের মত খাঁটি মানুষ দেখলেই ভালবেসে ফেলা তাঁর স্বভাব। নীলমণি খাঁটি চরিত্রের মানুষ, এ খবর তাঁর জানা ছিল। নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন নীলমণিকে। দান করলেন মেছুয়া-বাজারের কাছে এক প্রস্ত জমি। নীলমণি সেইখানে বাড়ি তুললেন। সেই থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জন্ম। সেটা কিন্তু রাজবাড়ি নয় কোন কালেই।

নীলমণি ঠাকুরের তিন ছেলে। রামলোচন রামমণি আর রাম-বল্লভ। আর এক মেয়ে কমলমণি। রামলোচন আর রামমণি এঁরা বিয়ে করেছিলেন একই পরিবারের দুই বোনকে। অলকা দেবীকে রামলোচন। মেনকা দেবীকে রামমণি। রামলোচনের একটি মেয়ে হয়ে মারা যায় অকালে। রামমণির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মেনকা দেবী। তাঁর দুই ছেলে। রাধানাথ আর দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের জন্ম ১৭৯৪-এ। বয়স যখন মোটে এক, যখন মুখ দিয়ে ভাল করে মা বোলটাও ফোটেনি, সেই কচি-কুঁড়ির সময়েই মারা গেলেন মেনকা দেবী। রামলোচন পোষ্যপুত্র নিলেন মেজো ভায়ের ছোট ছেলে দ্বারকা-নাথকে। শাঁখ বাজল। পুরোহিত পড়লেন মন্ত্র। ধূপ-ধুনোর গন্ধে বাতাস হয়ে উঠল মিষ্টি। আর এই ধুমধামের মধ্যে রামমণির ছোট

ছেলে হয়ে গেলো তাঁর জ্যেঠামশায়ের পোষ্যপুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী। দ্বারকানাথের বয়স তখন পাঁচ। সেই থেকে চিরকাল রামলোচনের স্ত্রী অলকাসুন্দরীই তাঁর আপন মা।

তারপর পাঠশালা। পাঠশালা পেরিয়ে স্কুল। চিৎপুর রোডে শেরবোর্ন সাহেবের স্কুল। কিন্তু স্কুলে মন বসল না বেশীদিন। ছেড়ে দিলেন। স্কুল ছাড়লেন বটে, লেখাপড়া ছাড়লেন না। ঘরে বসেই চলল নিয়ম করে পড়াশোনা। তখনকার কলকাতায় ম্যাকিনটস নামে ছিল এক কোম্পানি। সওদাগরী ব্যবসায় শহর জুড়ে নাম-ডাক। সেই কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিবারের ছিল খুব মেলামেশা। দ্বারকানাথের ইংরেজী শেখা তাঁদের কাছেই। ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃত, আরবী, ফারসীও শিখতে লাগলেন মন দিয়ে। বেশ কাটছিল ছেলেবেলাটা তরতরিয়ে মনের সুখে। হঠাৎ এগিয়ে এল ঝড়-ঝাপটার দিন। দ্বারকানাথের বয়স মাত্র বারো কি তেরোর মত, সেই সময় মারা গেলেন রামলোচন। অলকাসুন্দরীর কপাল থেকে মুছে গেলো লাল সিঁদুরের টিপ। নাবালক দ্বারকানাথকে বুকে জড়িয়ে মনের শোক জুড়োতে লাগলেন তিনি। কিছুদিন বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার পড়ল দ্বারকানাথের দাদা রাধানাথের উপর। দ্রুত সাবালক হয়ে ওঠার জন্যে দ্বারকানাথ তৈরী করতে লাগলেন নিজেকে। যৌবনের দোরগোড়ায় পা দিতে না দিতেই গোমস্তার চাকরী নিলেন ম্যাকিনটস কোম্পানিতে। রেশম আর নীল জোগাড় করার কাজ। অল্প দিনের মধ্যেই শিখে নিলেন ব্যবসার নিয়মকানুন, আদবকায়দা। তারপর নিজেই নেমে পড়লেন ব্যবসায়। অর্ডার মত মাল কিনে চালান দিতে লাগলেন য়ুরোপে। আর সেই সঙ্গে মন দিলেন আইন শেখায়। উত্তরাধিকার সূত্রে যেটুকু জমিদারি পেয়েছেন, তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে আইনের ঘোর-প্যাঁচ জানতেই হবে ভালো মতন। আইন শিখতে লাগলেন মিঃ কাটলার ফারগুসনের কাছ থেকে। তিনি তখন সুপ্রীম কোর্টের জাঁদরেল ব্যারিস্টার। আইনের মত শক্ত জিনিসকে দ্বারকানাথ অল্প দিনের মধ্যেই আয়ত্ত

করে ফেললেন সহজেই। নিজের জমিদারি এলাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি। ডাক আসতে লাগল রাজা-মহারাজাদের কাছ থেকে। তাঁর উপর নজর পড়ল সরকারী কর্তা-ব্যক্তিদেরও। কিছুদিনের মধ্যেই খালি হল ২৪ পরগনার কালেকটর আর সল্ট এজেণ্ট মিঃ গ্লাউডনের অধীনে দেওয়ানের পদ। কাকে বসানো যায়? কেন, দ্বারকানাথ। ওর মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক এখন লাখে এক। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল। দ্বারকানাথের বয়স তখন মোটে ২৪। এক-টানা ছ' বছরের চাকরী। কোথাও এতটুকু গলদ গাফিলতির আঁকচারা নেই কাজে। উন্নতিরও অন্ত নেই। পাঁচ বছরে হয়ে গেলেন কোম্পানির নিমকমহলের দেওয়ান। তার পাঁচ বছর পরেই শুল্ক, নুন আর অফিস বোর্ডের দেওয়ান। সেই সঙ্গে চলেছে বাংলা বিহারের বহু নামকরা জমিদারদের আইন বিষয়ে পরামর্শদাতার কাজ। কিনে ফেলেছেন ম্যাকিনটস কোম্পানির শেয়ার। হাতে অগাধ টাকা-পয়সা। কলকাতায় তখন বাঙালীর কোন ব্যাঙ্ক ছিল না। যা ছিল সাহেবদের। দ্বারকানাথ গড়লেন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক। আরম্ভ যখন, তখন মূলধন ১৬ লক্ষ টাকা। ন'বছর পরে ৪০ লক্ষ হয়ে উঠল ফুলে-ফেঁপে। পরের বছর ১ কোটি টাকা। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথের আমলে উঠে গেল সে ব্যাঙ্ক।

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল ১৮৩৩। ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়েছে 'শিল্প বিপ্লব'। তার মানে এককালে মানুষ যা করতো হাতে, এখন সে কাজ করবে যন্ত্র। যন্ত্রের হাত বুনবে কাপড়। যন্ত্রের ঠেলায় জলে ছুটবে জাহাজ। যন্ত্র মন্ত্রবলে ঘোরাবে চাকা। লোহা-লক্কড়ের মত ভারী জিনিসকে দরকার হলে করে দেবে জলের মত পাতলা। আবার তরল লোহাকে বানিয়ে দেবে যেমন দরকার, তেমন শক্ত চেহারা। হাতে করতে যে-কাজে লাগতো একদিন, যন্ত্র সেটা ঘটিয়ে দেবে এক ঘণ্টায়। এর ফলে আগের চেয়ে বেড়ে চলেছে জিনিসপত্রের উৎপাদন। উৎপাদন বাড়লেই সেটা ছড়িয়ে দিতে হবে দশদিকে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকদিগন্ত আগের চেয়ে লম্বা এবং চওড়া হয়েছে অনেক। দেশে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসায়ী, বড় বড় ধনী। আর এই নিয়ে খিটির-মিটির চলেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এইসব নতুন ধনীদের। তারা চাইছে ভারতবর্ষে এসে ব্যবসা করবে। বসবাস করবে। কোম্পানি নারাজ। তাই নিয়ে তুমুল আন্দোলন-আলোড়ন। কোম্পানি শেষ পর্যন্ত মাথা হেঁট করে মেনে নিল ব্যবসায়ীদের

দাবী। এখন থেকে ভারতবর্ষে ব্যবসা করার, জমি-জমা কিনে বসবাস করার অধিকার সকলেরই।

দ্বারকানাথ বাল্যকাল থেকে বুদ্ধিমান। বাতাসের মতিগতি বুঝতে এক বিন্দু দেরী হয় না তাঁর। তিনি বুঝে গেলেন, সামনে নতুন যুগের হাওয়া। এই হাওয়াতে তুলতে হবে যে-পাল সেটা কোম্পানির নয়। স্বাধীন ব্যবসার। বাঙালীরা বেনিয়া হতে খুব তৎপর। ব্যবসায়ী হতে বুক থরথর। আমি ব্যবসায়ী হবো। ইস্তফা দিলেন বিরাট সম্মানের চাকরী থেকে, রেভিনিউ বোর্ডের কাছে। চিঠি পেয়ে বোর্ডের সদস্যদের মাথায় হাত। আচমকা বজ্রাঘাত যেন। দ্বারকানাথের মত মানুষ চলে গেলে তার জুড়ি মিলবে কোথায়? তবু বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হল পদত্যাগ। রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী তখন হেনরী মেরিডিথ পার্কার। তিনি দ্বারকানাথকে লিখলেন দু'খানা চিঠি। একটা সরকারী পদত্যাগ মেনে নিয়ে। দ্বিতীয়টা ব্যক্তিগত। পদত্যাগের জন্যে বেদনা জানিয়ে।

তখন এদেশে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। দ্বারকানাথের সঙ্গে খুবই ভাব-ভালবাসা, দহরম-মহরম। এই বেণ্টিঙ্ক-এর আমলেই এদেশে রদ হয়েছিল সতীদাহের ঘৃণ্য প্রথা। সকলেই জানো, এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু আগুনের সঙ্গে যেমন গায়ে গায়ে মিশে থাকে উত্তাপ, রামমোহনের সঙ্গে এই আন্দোলনের বেলায় তেমনি জুড়ে ছিলেন দ্বারকানাথ। ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করা হল। তারপর লেডি বেণ্টিঙ্ক এক ব্যক্তিগত চিঠিতে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দ্বারকানাথকে এই আন্দোলনে রামমোহনের সঙ্গী হিসেবে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের মারফতেই আলাপ হল একজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর সঙ্গে। নাম উইলিয়ম কার। দুজনে মিলে গড়লেন এক নতুন প্রতিষ্ঠান। কার-ঠাকুর কোম্পানি। এই কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল নীলের চাষ। সেটা যেন ব্যবসার শক্ত গুঁড়ি। কিন্তু তা ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের যতরকম দিক আছে,

সব কিছুর দিকেই কোম্পানির ডালপালা ছড়ানো। খিদিরপুরে জাহাজ মেরামতের কারখানা। তখন সবে বাষ্পে-চলা জলযান শুরু করেছে দেখা দিতে। কার-ঠাকুর কোম্পানি হয়ে গেল স্টীম টাগ এসোসিয়েশনের এজেন্ট। রামনগরে তৈরী হল চিনির কারখানা। কুমারখালিতে রেশমের কুঠি। শিয়ালদহে নীলের আপিস। নেওয়া হল রানীগঞ্জের কয়লাখনির ইজারা। তৈরী হল বেঙ্গল কোল কোম্পানি।

দ্বারকানাথ তখন কলকাতায় এক ডাকে চেনার মত ধনী মানুষ। নিজের চেষ্টায় ধনী হওয়া খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ধনী মানুষের দ্বারকানাথ হয়ে ওঠা। দ্বারকানাথ শৌখিন বাবু এবং বিলাসী, ঠিকই। কিন্তু ঐ বিলাসী মানুষটির বাইরের জাঁক-জমকের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো আর একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। সে মানুষের দু'চোখে স্বপ্ন। স্বপ্ন নিজের দেশকে নিয়ে। শুধু নিজে বড় হওয়ায় কোনো মহত্ত্ব নেই। বড় করে তুলতে হবে নিজের দেশকে। গোড়ায় ছিলেন কিছুটা গোঁড়া। যেদিন থেকে বয়সে ২২ বছরের বড় রাজা রামমোহনের সঙ্গে গলায়-গলায় বন্ধুত্ব, একেবারে ভিন্ন মানুষ। জপ-তপ, পুজো-আচ্চা রইল বটে, গোঁড়ামি গেল। মূর্তি-পূজা বাদ দিয়ে বেছে নিলেন ধ্যানের উপাসনা।

বেলগাছিয়ায় তাঁর বাগানবাড়ি। বাড়ি নয়, সে যেন এক রাজত্ব। ঐশ্বর্যের, আড়ম্বরের, নাচের, গানের, ভোজসভার, আলোর, ফুলের, বাজির, বাজনার। সাহেব, মেম, রাজা-মহারাজাদের নিত্য আসা-যাওয়া খানাপিনা সেখানে। কিন্তু সেইটুকু আসল দ্বারকানাথ নয়।

দ্বারকানাথ ছিলেন উদার দানে, ছিলেন সংগঠনে, নতুন যুগ সৃষ্টির উদ্যমে। এমন কোন শিক্ষা কিংবা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না তখন, যা দ্বারকানাথের সাহায্যে পুষ্ট নয়। এমন কোন সামাজিক অন্যায় অথবা অবিচার নেই, যার প্রতিবাদ করেননি তিনি। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে। সতীদাহের বিরুদ্ধে। হিন্দু কলেজের ভিতরের মানুষ তিনি। তিনি মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। নিয়মিত অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, সাধারণ মানুষের অনেক বিদ্রূপ এবং বিরোধিতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি ঐ কলেজকে গড়ে তুলেছিলেন মনের মত করে। তখন সারা হিন্দু সমাজ শব-কাটাকাটির বিরুদ্ধে। দ্বারকানাথ নিজে কলেজে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উৎসাহ জোগাতেন ঐ কাজে। শব-ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে ধর্মের কোনো

সম্পর্কই নেই। বরং এই কাজে আমরা যদি এগোতে পারি দেশে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি হবে। দেশবাসী রোগমুক্ত হবে। তাঁর প্রেরণা-তেই মধুসূদন গুপ্ত একদিন হাতে তুলে নিলেন শব-কাটবার ছুরি। সরকারের পক্ষ থেকে তোপধ্বনি করে সম্মান জানানো হল এই সাধু এবং সাহসী প্রচেষ্টাকে। এর পর দ্বারকানাথ প্রত্যেক তিন বছর অন্তর দু'হাজার করে টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন ছাত্রদের জন্যে। দ্বিতীয় বার যখন বিলেত গিয়েছিলেন, মোট চারজন ডাক্তারী ছাত্র ছিল সঙ্গে। তার মধ্যে দু'জন ছাত্র দ্বারকানাথের নিজের খরচে, বাকী দু'জন ছাত্র সরকারী খরচে। উদ্দেশ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ। এই চারজন ছাত্রের নাম সূর্যকুমার চক্রবর্তী, ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, গোপাললাল শীল।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চাই। নইলে একটা দেশ এগিয়ে চলতে পারবে না। দ্বারকানাথ আছেন সেই আন্দোলনে। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে দ্রুত ডাক-বিনিময় না হলে শাসক এবং প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ ও সংযোগ স্থাপনের অসুবিধে। দ্বারকানাথ সেই উদ্যোগে উৎসাহী। জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যে তখন প্রয়োজন ছিল একটা সংগঠনের। তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে গড়লেন এক সমিতি। নাম ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি। এছাড়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে বাঙালী জাতির চিন্তার আদান-প্রদানের এবং দুই পক্ষের স্বার্থের উন্নতির জন্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। তখনকার দিনের সেরা সংবাদপত্র প্রভাকর। বিখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্ত যার সম্পাদক। প্রভাকর পত্রিকাকেও তিনি সাহায্য করেছেন নানাভাবে। রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্যে য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষের যোগ্য ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টির জন্যে ইংরেজদের কাছে তাঁর মতামত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লর্ড অকল্যাণ্ড যখন ভারতবর্ষের গভর্নর, তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়িতে প্রায়ই নিমন্ত্রণের ডাক পড়ত দ্বারকানাথের। আর প্রত্যেক বুধবারে গভর্নমেণ্ট হাউসে। দ্বারকা-নাথের সঙ্গে পরামর্শ না করে অকল্যাণ্ড সহজে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না।

একবার আগ্রায় বেড়াতে গেছেন দ্বারকানাথ। ঘুরে ঘুরে দেখছেন আগ্রা ফোর্ট। হঠাৎ একদল সৈন্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের হাতের বন্দুক নামানো। চোখের চাউনিটাও। গলায় বিনীত নিবেদন। আমাদের গীর্জাটা নষ্ট হয়ে গেছে। সরকারী সাহায্য আসছে না।

আপনি যদি সাহায্য করেন। দ্বারকানাথ সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ-খবর নিলেন, ঘটনাটা কত দূর সত্যি। তারপর হাতে হাতেই ৫০০ টাকা। কলকাতার সেণ্ট টমাস চার্চে ঘড়ি নেই। কে দান করতে পারে? কেন, দ্বারকানাথ। আর্চ বিশপ কেরু আবেদন জানাতে-না-জানাতেই তিনি রাজী।

একবার 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা দ্বারকানাথকে আক্রমণ করল। ঐ কাগজের সম্পাদক তখন হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার রসিককৃষ্ণ মল্লিক। কাগজটা বেরোয় একই সঙ্গে দুটো ভাষায়। ইংরেজী এবং বাংলা। আক্রমণের ভাষা পড়ে দ্বারকানাথের এক আত্মীয় পরামর্শ দিলেন, তোমার উচিত রসিককৃষ্ণকে সোজাসুজি চাবুকে আসা। দ্বারকানাথ হাসলেন। কাউকে চাবুক মেরে শিক্ষা দেওয়ার মত মনের গড়ন ছিল না তাঁর। মারের বদলে একদিন সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে। সেই ভোজসভাতেই ভোজবাজির মত উড়ে গেল দু'পক্ষের মন-কষাকষি।

অপরকে খাইয়ে খুব আনন্দ পেতেন দ্বারকানাথ। বেড়াতে গেছেন মথুরা এবং বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদের জন্যে একদিন তিনি দশ হাজার টাকা খরচ করে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্মণরা লোটায় করে ভাঙ নিয়ে এসে খেতে বসলেন। ভাঙ খেলে খিদে বাড়ে। খাবার আগে ভাঙ খেয়ে খিদেটাকে আগুন করে নিলেন তাঁরা। তারপর চর্ব্যচোষ্য করে আহার। এক-একজন তিনচার সের করে পুরী আর মিঠাই। আর যে-মুখে আহার সেই মুখেই জয়ধ্বনি, দ্বারকানাথ বাবুকী জয়।

দ্বারকানাথের জয়ধ্বনি শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও।

বিলেতে গেছেন বন্ধু রামমোহন। তাঁর চিঠিতে পান সে-দেশের নানান চোখ-জুড়নো ছবি, মন-মাতানো গল্প। বিদেশে পাড়ি দেবার ইচ্ছে তোলপাড় ঢেউ তোলে মনে। উন্নত সভ্যতার দেশগুলোকে কবে দেখবো নিজের চোখে?

যাবার জন্যে পা যেন বাড়ানো। মনের পিঠে আঁটা হয়ে আছে

ডানা। তবুও যেতে পারছিলেন না। দু'পায়ে দু'খানা বেড়ি। একটার নাম ব্যবসা। আরেকটার নাম সংসার।

এতক্ষণ সেই সংসারের কথা বলা হয়নি কিছু। দ্বারকানাথের বয়স তখন ১৫। বিয়ে হল দিগম্বরী দেবীর সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী। দুর্গা প্রতিমার মত মুখ। তখন ঠাকুরবাড়িতে ধুমধাম করে পুজো হত দুটো। শরতে দুর্গা। শীতে জগদ্ধাত্রী। প্রবাদ আছে, পুজোর জন্যে জগদ্ধাত্রীর যে মূর্তি তৈরী হত প্রত্যেক বছর, তাতে দেবীর মুখ আঁকা হত দিগম্বরী দেবীর আদলে।

এমন সুরূপা, তবুও স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি শিব-পার্বতীর মত। তার কারণ, দুটো চরিত্রের দু-রকম গড়ন। দিগম্বরীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের যাবতীয় সংস্কার। দ্বারকানাথের মধ্যে সংস্কারের নাম-গন্ধ নেই। স্বামী ম্লেচ্ছদের সঙ্গে ওঠেন, বসেন, খানাপিনা করেন। সুতরাং তাঁকে ছুঁতেও তাঁর আপত্তি। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে তক্ষুনি স্নান করে শুদ্ধ করে নিতেন নিজেকে। কিন্তু এইভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারে না। দ্বারকানাথও চাইলেন না, তাঁর স্ত্রীর জীবনকে বিপন্ন করতে। তাই নিজেকে সরিয়ে নিলেন সংসার থেকে। বসবাসের জন্যে বেছে নিলেন অন্দরমহলের বাইরে বৈঠকখানার ঘর।

দিগম্বরী দেবী মারা গেলেন তিন ছেলে রেখে। দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ।

আর সংসারে মন নেই। ব্যবসা আর আগের মত উত্তেজনা জোগায় না। এখন শুধু ইচ্ছে করে ইয়োরোপটাকে আগাগোড়া ঘুরে, দেখে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বাড়ানো। পৃথিবীকে জানা।

১৮৭২-র জানুয়ারি মাস। তারিখ ৯। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় এবং দেশবাসীর কাছ থেকে বিদায়-সংবর্ধনা নিয়ে চেপে বসলেন 'ইণ্ডিয়া' নামের জাহাজে। সঙ্গে ভাগনে চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী, একান্ত সচিব পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু ভৃত্য, একজন মুসলমান খানসামা আর চিকিৎসক ম্যাক্ গাওয়ান।

সুয়েজ ছুঁয়ে, কায়রো ছুঁয়ে, রোম এবং জার্মানির ঐশ্বর্য দেখে

চোখ জুড়োতে জুড়োতে জুন মাসের দশ তারিখে পেঁছিলেন লণ্ডনে। তারপর থেকে কেবল ভোজের নিমন্ত্রণ। পেঁছিবার ছ'দিন পরেই এল সেই চরম শুভদিন। মহারানী ভিকটোরিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের নিমন্ত্রণ। মহারানী এবং তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল ঐ দিন বেলা দুটোর সময়। তারপর একে একে রাজপরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে। কয়েকদিন পরে আবার নিমন্ত্রণ মহারানীর সঙ্গে বৃহৎ সৈন্য সমাবেশ দেখার জন্যে। তার কিছুদিন পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ মহারানীর সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বারকানাথ তাস খেললেন ডাচেস অব কেণ্টের সঙ্গে। মহারানী তাঁকে উপহার দিলেন টাঁকশালে সেদিনের তৈরী তিনটি স্বর্ণমুদ্রা।

যেখানে যান, সেখানেই সম্মান এবং সংবর্ধনা। ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পেঁছিলেন ব্রিস্টলে। প্রিয় বন্ধু রামমোহনের সমাধি দেখতে। শুধু দেখেই ফিরে গেলেন না। চোখের জল মুছে ব্যবস্থা করলেন স্টেপলস্টোন গ্রেভ থেকে শবদেহ তুলে 'আরনোস্ ভেল' নামের অন্য এক জায়গায় সেটিকে নতুন করে স্থাপন করার। গড়া হল নতুন সমাধিস্তম্ভ। নতুন স্মৃতি-ফলক।

আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে। আসতে না আসতেই নিমন্ত্রণ এল মহারানীর কাছ থেকে। সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজের আসরে দ্বারকানাথের অনুরোধে মহারানী সম্মত হলেন তাঁদের দু'জনের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি তৈরী করতে দিতে। কলকাতা নগরীর জন্যে তাঁর উপহার। সে প্রতিকৃতি কলকাতার টাউন হলে টাঙানো হয়েছিল পরে। সেই সঙ্গে দ্বারকানাথকে উপহার দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি তৈরীর। লণ্ডনেই বিশ্ব-বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এবার প্যারিসে পাড়ি দেওয়ার পালা। এবং প্যারিসেও সেই একই সমাদর, একই রকম জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা। সেখানেও রাজা এবং রানীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়।

বছরের শেষে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। কলকাতায় পা দিতে না দিতেই নিন্দা এবং সমালোচনার ঝড়। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যে-লোকটা ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া করছে, একঘরে করা হোক তাকে। দ্বারকানাথ অবিচলিত। মাটির ভিতরে শিকড় গেঁথে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করা অক্ষয় বট যেন। এই সময় থেকে অন্দরমহলের সঙ্গে যোগাযোগ চুকিয়ে তিনি একা থাকতেন বাইরের বাড়িতে। আর বেশী করে মনোযোগ দিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যে।

বছরের শেষ দিকে তাঁর হাতে এল রানীর পক্ষ থেকে লেখা একটি চিঠি। রাজা ও রানীর ক্ষুদ্রাবয়ব প্রতিকৃতি দুটি পাঠানো হয়ে গেছে। এ ছাড়া রানীর আরো একটি প্রতিকৃতি দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে পাঠানো হবে শীঘ্রই।

১৮৪৫। মার্চ মাসের ৮ তারিখ। দ্বারকানাথ আবার পাড়ি দিলেন ইংলণ্ডে। এবারের সঙ্গী কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ। যাওয়ার পথে প্যারিসে কাটালেন কিছুদিন। পরিচয় হল প্রখ্যাত মনীষী ম্যাকস্‌মুলারের সঙ্গে। ম্যাকস্‌মুলার রোজ আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা হত। আর হত গান। দ্বারকানাথ গাইতেন ইতালীর আর ফ্রানসের গান। পিয়ানো বাজাতেন ম্যাকস্‌মুলার। ম্যাকস্‌মুলার-এর মুখের কথায় আঁকা আছে সেই সময়ের ছবি।

"দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনীর আয়োজন করেন। তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরী শাল দ্বারা সজ্জিত করিয়েছিলেন। তখন কাশ্মীরের শাল ফরাসী স্ত্রীলোকদের এক আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সুতরাং কল্পনা কর, যে কী তাদের আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়াইয়া দিলেন।"

লণ্ডনে পৌঁছলে আগের চেয়ে আরো বেশী সম্মান। এমন সম্মান যা কেউ কল্পনা করেনি। রানীর ড্রইংরুমে, রানীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াবার অধিকার। দ্বারকানাথ রানীর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রচুর উপহার। রানী তার মধ্যে থেকে বেছে নিলেন মাত্র কয়েকটি। রাজা নিলেন শালের একটা চোগা। এরপর বাকিংহাম প্যালেসে আর একদিনের বিশেষ নিমন্ত্রণে দ্বারকানাথকে উপহার দেওয়া হল রানীর

প্রতিকৃতিটি। নীচে রানীর নিজের হাতের লেখা, 'দ্বারকানাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া আর এলবার্ট'।

লণ্ডন ছেড়ে নানা জায়গায় ঘুরে জুনের শেষ দিকে একদিন ডাচেস অব ইনভারনেসের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় হঠাৎ এল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। মহিলারা নিজেদের গায়ের শাল খুলে চাপা দিলেন তাঁর শরীরে। ভাঙা শরীরটাকে খাড়া করে এর পর চলে এলেন ওয়ার্দিং নামে এক স্বাস্থ্যকর জায়গায়। সঙ্গে চিকিৎসক মার্টিন। তবু উন্নতি হল না স্বাস্থ্যের। আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে। জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। রোগে অবসন্ন। তবু কেউ দেখা করতে এলে বলেন, আই অ্যাম কনটেণ্ট। তারপর বেশীদিন গেল না।

১৮৪৬। আগস্টের প্রথম দিন। পৃথিবীতে আকাশের ঝড়-ঝঞ্ঝা। দ্বারকানাথ শেষ নিশ্বাস ফেললেন। মৃত্যুর পরেও তাঁকে দেখাচ্ছিল প্রশান্ত। যেন বলতে চাইছেন, আমি সুখী, আমি তৃপ্ত।

রাজা রাজেন্দ্রলাল

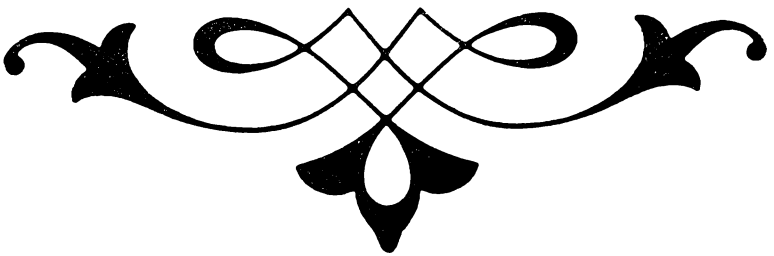

সিরাজউদ্দৌলার দাদু তখন বাংলার নবাব। সিংহাসনে সবেমাত্র পা ছড়িয়ে বসেছেন তিনি, অমনি বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে ভেসে এল হৈ হৈ রৈ রৈ ডাক। চমকে উঠলেন আলিবর্দী। কিসের শব্দ? উত্তর এল, ভরা গাঙের জোয়ারের মত ছুটে আসছে বর্গিরা। তাদের ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়ছে যেন সমুদ্দুরের ফেনা। হাতে খোলা তলোয়ার, বুকে দুর্দান্ত সাহস আর মুখে মারাত্মক দাবী, চৌথ চাই।

চৌথ কথাটার মানে, নবাব দিল্লীর বাদশাকে বছরে বছরে রাজস্ব দেন যত টাকা, তার চার ভাগের এক ভাগ। দিল্লীর অপদার্থ বাদশাকে আক্রমণে আক্রমণে কাবু করে, মারাঠারা আদায় করে নিয়েছে এই চৌথ পাওয়ার অধিকারটা।

সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে তারা ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। বিষ্ণুপুর পেরিয়ে, বীরভূমের শালবন ডিঙিয়ে এখন তারা কাটোয়ার দিকে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক

এবার একদল পেরোবে ভাগীরথী। আর একদল আক্রমণ করবে মুর্শিদাবাদ। দলের নেতা, ভাস্কর পণ্ডিত।

আলিবর্দী বীর। হুংকার দিয়ে উঠলেন খবর শুনে। ওঃ, সেই নগণ্য মারাঠারা? আওরঙ্গজেব যাদের বলতেন, পার্বত্য মূষিক? দাঁড়াও, পিঁপড়ের মত নখে টিপে মারছি ওদের। সাজাও সৈন্যসামন্ত। বাজাও যুদ্ধের ভেরী।

আলিবর্দী বীরদর্পে ছুটে চললেন রণক্ষেত্রে। ওদিকে তখন অন্য দৃশ্য দেশ জুড়ে। গ্রামকে গ্রাম উজাড়। বর্গির ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে বাপ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে। বর্গির ভয়, বড় ভয়। ওরা আগুন জ্বালাবে ঘরে ঘরে। লুট করবে মাঠের ধান, ঘরের ধন, গায়ের গয়না। ছেলে-বুড়ো নির্বিচারে হত্যা করেও হাত কাঁপবে না তাদের। অতএব, প্রাণ বাঁচাতে যে দিকে পারো, পালাও। মধু শীল সেকালের একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ। বাস করতেন সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। তারপর যখন সপ্তগ্রামের নাম-ডাক হল বন্দর হিসেবে, যখন পৃথিবীর নানান দেশের জাহাজ ছুটে আসতে লাগল সেখানে, ব্যবসার জিনিস কিনতে এবং বেচতে, মধু শীলের বংশধরেরা চলে এলেন সপ্তগ্রামে। তারপর, বেশ কিছুকাল পরে, যখন সপ্তগ্রামের জেল্লা-জৌলুষ নিভতে নিভতে একদম ম্লান, মধু শীলের বংশধর চলে এলেন হুগলীতে। ইতিমধ্যে তাঁরা উপাধি পেয়েছেন মল্লিক।

বাংলাদেশে যখন বর্গির হাঙ্গামা, তখন শীলবংশের প্রধান পুরুষ, জয়রাম মল্লিক। আর দশজনের দেখাদেখি তিনিও পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। উঠলেন গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুরে তখন অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীর বাস। আছেন শেঠেরা, আছেন বসাক, আছে ঠাকুর পরিবার। তা ছাড়া কলকাতা অনেক নিরাপদ। এখানে ইংরেজ আছে, ইংরেজদের দুর্গ আছে। দুর্গে কামান বন্দুক সাজানো আছে। সুতরাং ভয় নেই। কয়েক বছর বাদে মিটে গেল বর্গির হাঙ্গামা। মারা গেলেন আলিবর্দী। তাঁর জায়গায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হলেন নাতি সিরাজউদ্দৌলা। একবার ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া লাগল সিরাজের। তিনি ছুটে এলেন কলকাতা আক্রমণ করতে। যুদ্ধে জয় হল তাঁর। ইংরেজদের লাঞ্ছনা আর অপমানের একশেষ। তারা গোপনে তৈরী হতে লাগল বদলা নেবার জন্যে। একদিন এসে গেল সুযোগ। যুদ্ধ লাগল পলাশীর মাঠে। সিরাজের আপন জনেরা গোপনে যোগ দিল ইংরেজের সঙ্গে। সিরাজ

যুদ্ধে হারলেন। হেরে গিয়ে প্রাণে বাঁচার জন্যে তিনি পালাচ্ছিলেন রাজধানী ছেড়ে। মাঝপথ থেকে তাঁকে ধরে রাজধানীতে এনে বন্দী করে রাখা হল কারাগারে। তারপর তাঁকে হত্যা করল তাঁরই বিশ্বস্ত কর্মচারী। ইংরেজদের জয়জয়কার। জয়জয়কার ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের। তাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা। এমন ক্ষমতা যে এখন তারা একটা পুতুলকে বানাতে পারে বাংলার নবাব। অথবা একজন নবাবকে হাতের পুতুল। সিরাজের পর তাঁর সেনাপতি মীরজাফরকে তারা সাজাল সেইরকম পুতুল-নবাব।

পলাশীর যুদ্ধটা ঘটেছিল ১৭৫৭-য়। তারপর এক বছর যেতে না যেতেই ক্লাইভ ঠিক করলেন পুরনো কেল্লাটা ভেঙে গড়বেন নতুন আরেকটা। তখন পুরনো কেল্লাটা ছিল এখনকার জি. পি. ও-র কাছে। এখন নতুন জায়গা ঠিক হল গোবিন্দপুর। সর্বনাশ! তাহলে গোবিন্দ-পুরের বাসিন্দেরা যাবে কোথায়? ইংরেজরা জানালে, ভাবনা নেই। জায়গার বদলে জায়গা দিচ্ছি আমরা। গোবিন্দপুরের বেশীর ভাগ লোকেরাই জায়গা পেলেন পাথুরেঘাটায়। চলে এলেন জয়রাম মল্লিকও।

জয়রামের ছ' ছেলে। বড় পদ্মলোচন।পদ্মলোচনের এক ছেলে, শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের দুই ছেলে। বড় গঙ্গাবিষ্ণু, ছোট রামকৃষ্ণ। মল্লিক বংশ চিরকালই ব্যবসায়ী। গঙ্গাবিষ্ণুর আমলে ব্যবসার পরিধি কলকাতা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলাদেশে। পরে তাতেও কুলোল না। ব্যবসায়-লেনদেন শুরু হয়ে গেল চীন, সিঙ্গাপুর এবং আরও সব বিদেশী বন্দরে।

গঙ্গাবিষ্ণুর আমলে শুধু ব্যবসাই বটের মত বিরাট হয়ে উঠল না; বটের গায়ের ঝুরির মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল মল্লিক বংশের খ্যাতি। সেই খ্যাতির মূলে ছিল গঙ্গাবিষ্ণুর চওড়া বুক, যার ভিতরটা বোঝাই দয়া আর দাক্ষিণ্য আর ভালবাসায়। ভালবাসা শুধু নিজের আত্মীয় স্বজনের নয়, দীন-দুঃখী সকলের জন্যে। সেটা ছিল বাংলার ১১৭৬ সাল। ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেবার বাংলাদেশ

জুড়ে। ইতিহাসে তার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই বিপদের দিনে নিজের বসত বাড়ির উল্টোদিকে তিনি খুলেছিলেন একটা অন্নসত্র। কোন জাত-বেজাতের বিচার নেই, যে আসবে, সেই পাবে খেতে। শুধু অন্ন নয়, ওষুধও জোগাতেন দরিদ্রদের। নিজের খরচে ওষুধ তৈরী করাতেন নামজাদা কবিরাজদের মাইনে দিয়ে রেখে।

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক তখন কলকাতার, বিশেষ করে সুবর্ণবণিক সমাজের একজন সেরা মানুষ। তাঁর পরামর্শ না নিয়ে এক পা হাঁটে না কেউ। সেই গঙ্গাবিষ্ণুর এক ছেলে নীলমণি মল্লিক। নীলমণি বংশের নয়নমণি। স্বভাবে-চরিত্রে যেমন বাপ তেমনি ছেলে। বাবা খুলেছিলেন অন্নসত্র। ছেলে হুকুমজারি করল, 'কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেন আমার বাড়ি থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে না যায়। যদি কোনো কারণে তাকে সাহায্য করা সম্ভব না হয়, তাহলে আমার নিজের খাবার থেকে অংশ দেওয়া হয় যেন।' দরিদ্র এবং বিপন্ন মানুষের জন্যে তিনি খুললেন 'সদাব্রত'। এই অতিথিশালায় যে কেউ আসুক তাঁকে দেওয়া হতো কাঁচা সিধা আর সেগুলো রেঁধে নেওয়ার জায়গা।

গঙ্গায় তৈরী করে দিলেন স্নানের ঘাট। নাম হয়েছিল, নীলমণি মল্লিকের ঘাট। মেয়ে-পুরুষ, দু-পক্ষের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্যে স্নানের ঘাটের গায়ে চালাঘর। গরীবদের জন্যে বিনাপয়সার ডাক্তারখানা। ঋণের দায়ে আটকা পড়েছে কেউ? ঠিক সময়ে টাকা দিতে না পারলে জেল? নীলমণি জামিন। মৃতদেহ সৎকার হচ্ছে না, টাকা জোগাবে কে? নীলমণি। সম্পত্তি নিলাম হয়ে যাচ্ছে কারো, বাঁচাবে কে? নীলমণি।

নীলমণি শুধু দানে-ধ্যানেই ছিলেন না, ছিলেন নাচে, গানে, উৎসবেও। ন-দিন জুড়ে রথযাত্রার উৎসব হত তাঁর বাড়িতে। তাঁর মৃত্যুর পর যখন কুড়ি-বাইশ বছর পার হয়ে গেছে, তখনও সাধু-সন্ন্যাসী অথবা দরিদ্র মানুষেরা তাঁর বাড়ির সামনে এসে চীৎকার করে বলেছে, 'জয় নীলমণি মল্লিকের জয়।' এহেন নীলমণির জীবনে একটিই দুঃখ। বিধাতা তাঁকে সব দিয়েছিলেন, কেবল একটি ছাড়া।

সেটি হল সন্তান। শেষ পর্যন্ত, যখন মৃত্যু প্রায় মাথার কাছে হাজির, সেই সময় দত্তক নিলেন তিনি। নাম রাজেন্দ্র। ৪৬ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন, রাজেন্দ্রর বয়স তখন ৩।

মায়ের নাম হীরামণি। বাপ-হারানো ছেলে জন্ম থেকে মাকে বুকে জড়িয়ে মানুষ। আর মাকে জড়িয়ে আছে হাজার রকমের কষ্ট। নীলমণির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-আশয় নিয়ে লাগল ভায়ে ভায়ে বিরোধ। আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠেছিল পারিবারিক মনো-মালিন্য। রাজেন্দ্রকে বুকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে এলেন চোরবাগানে। চোরবাগানের জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ি নীলমণির নিজের হাতে গড়া। আশ্রয় নিলেন সেই ঠাকুরবাড়িতে। যেহেতু রাজেন্দ্র সম্পত্তির মালিক হয়েও নাবালক, তাই কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর হাতে পেঁছিল সেটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। কিন্তু কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রথম দিকে পারিবারিক দান-ধ্যানের জন্যে এক পয়সাও দিতে রাজী নয়। হীরামণির বুকটা টনটনিয়ে উঠল ব্যথায়। স্বামীর ইচ্ছা এবং ব্রত তাহলে কি বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে? না। আমি নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি গয়না-গাটি যা আছে, সব বেচবো। সেই টাকায় চলবে দরিদ্রসেবার কাজ। তাই হল। নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রান্নাশালে। দরিদ্র-ভোজন শেষ না হলে অন্ন তোলেন না মুখে।

রাজেন্দ্র বড় হচ্ছেন। মায়ের চরিত্রের আদল ছাপ ফেলে চলেছে তারও মনের মধ্যে। এখন তিনি হিন্দু স্কুলের ছাত্র। আগে কিছুদিন পড়েছেন নিজের বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে।

এই সময়ে মা ছাড়া আরেকজন মানুষের প্রভাব পড়ল তাঁর মনে। তিনি মিঃ জে ডব্লিউ হগ্। সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে তিনি তখন রাজেন্দ্রদের অভিভাবক। ভালবাসতেন রাজেন্দ্রকে। রাজেন্দ্র বড় হোক, খ্যাতিমান হোক বাবার মত, মনে মনে এটাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। হগ সাহেবের ছিল আর একটা নেশা। পশুপাখি ভালবাসতেন তিনি। পাখিরা কি খেতে ভালবাসে, কেমন তাদের স্বভাব, কি রকম আদর পেলে খুশি হয় কে কতটা, এসবই জানতেন। জানাতেন রাজেন্দ্রকেও। উপহারও দিয়েছিলেন কয়েকটা পাখি। তাদের পালকের রঙ, স্বভাবের চপলতা, তাদের সরু গলার কাকলি, রাজেন্দ্রকে মুগ্ধ করে ফেলল সেই একরত্তি শৈশবেই।

যখন বয়স ১৬, তখন রাজেন্দ্র হাত দিলেন নিজের বাড়ি

বানানোয়। পাঁচ বছর পরে বাড়ি যখন শেষ, যে দেখে সেই-ই অবাক। এ যেন স্বপ্নে গড়া রাজপুরী। সত্যি সত্যি স্বপ্ন দিয়ে গড়া হয়নি, হয়েছিল পাথরে। সে পাথর এসেছে পৃথিবীর নানান দেশ থেকে। শুধু কি পাথর? এসেছে পাথর কেটে গড়া বিরাট বিরাট মূর্তি। যাকে বলে ভাস্কর্য। এসেছে তেল রঙে আঁকা ছবি। এসেছে ব্রোঞ্জের মূর্তি। জলের ফোয়ারা, ঝাড়লণ্ঠন আয়না আরো কত কি। সবই রয়ে গেছে ঠিক আগের মত। যে কোন দিন গিয়ে দেখে আসতে পারো তোমরা। আছে ফুলের বাগান, পাখির বাগান, এমন সব পাখি যা কখনো চোখে দেখেনি কলকাতা। শহর ঝেঁটিয়ে লোক ছুটে আসে এই বাড়ি দেখতে। সেই থেকে বাড়ির নাম মার্বেল প্যালেস। আজও রয়েছে। আজ শুধু কলকাতার নয়, ভারতবর্ষের নয়, দেশ-বিদেশের মানুষরাও এসে এবাড়ি দেখে যায়। তিনটে মানুষের প্রভাব পড়েছিল রাজেন্দ্র মল্লিকের জীবনে। বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন দান-ধ্যান আর গানের কান, আর সূক্ষ্ম রুচি। মায়ের কাছ থেকে চরিত্রের সরলতা, সবলতা আর স্নেহপরায়ণতা। অভিভাবক মিঃ হগের কাছ থেকে পশুপাখিকে ভালবাসা। এ-ছাড়া বাকি গুণগুলো তাঁর নিজের। যেমন স্থাপত্যের জ্ঞান, শিল্পের প্রতি টান, হাতে কলমে ছবি আঁকার ইচ্ছে, গান লিখে সুর বসানো। বাবা ছিলেন সেকালের 'হাফ-আখড়াই' গানের পৃষ্ঠপোষক। ছেলেকে প্রায়ই হতে হতো বিচারক। ভাষা জানতেন অনেকগুলো। ফারসী বলতেন গড়গড় করে।

বলতে গেলে রাজেন্দ্রই কলকাতায় পশুশালার জনক। তখনো আলিপুরের পশুশালা, যাকে আজ আমরা বলি 'চিড়িয়াখানা' তৈরী হয় নি। ওটা হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১লা জানুয়ারী। উদ্বোধন করেছিলেন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড। অবশ্য কলকাতার দু-প্রান্তে তখন চিড়িয়াখানা ছিল আরো দুটো। একটা ব্যারাকপুরে, আরেকটা মেটিয়াবুরুজে।

ব্যারাকপুরেরটা গড়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসলী। মেটিয়াবুরুজেরটা লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। এক চরমপত্র দিয়ে তাঁকে

সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলেন লর্ড ডালহৌসি। সিংহাসনের বদলে নির্বাসন। তবে এর জন্যে বৃত্তি পাবেন বছরে ১২ লাখ টাকা। মেটিয়া-বুরুজে এসে থামল একটা স্টিমার। সপরিবারে নামলেন রাজ্যহারা নবাব। ক্লাইভের আমলের দুটো বড় বড় বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল তাঁকে। নজরবন্দী জীবন। কিন্তু নজরটা তো রয়ে গেছে নবাবী ছাঁদের। মেটিয়াবুরুজেই গড়ে তুললেন এক সুখের রাজ্যপাট। গান-বাজনা, খানা-পিনা, বাগান-মজিল আর সেই সঙ্গে চিড়িয়াখানাও। সে চিড়িয়াখানায় নেই এমন জন্তু নেই।

ওয়াজিদ আলি আর রাজেন্দ্র মল্লিক, এঁরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের দুজনকেই তখন বলা হত, উত্তর এবং মধ্য ভারতে চিড়িয়া-খানার পথিকৃৎ। ওয়াজিদ আলির চিড়িয়াখানায় ছিল কৃত্রিম পাহাড়। সেইখানে খেলা করত হাজার হাজার সাপ। বিদেশী পর্যটকরা দেখে অবাক হতো সাপ পোষার এই অভিনব পদ্ধতি। অনেকে লিখেও গেছে এই দৃশ্যের বর্ণনা।

তবে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পেঁছিয়নি ওয়াজিদ আলির খ্যাতি। আর বিদেশ থেকে অজস্র সম্মান, শ্রদ্ধা, উপহার, পদক, জুটেছে রাজেন্দ্র-র কপালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর নিজের পশুশালা থেকে উপহার গেছে আশ্চর্য এবং দুর্লভ সব পাখি। গেছে লণ্ডনে, প্যারিসে, য়ুরোপের আরো নানা দেশে। লণ্ডন জুয়লজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে দিয়েছিলেন সম্মানিত সদস্যের পদ। অবৈতনিক সদস্যপদ পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে। বেলজিয়াম থেকে এসেছিল সদস্যপদের আমন্ত্রণ। নিজের দেশেও পেয়েছিলেন অনেক সম্মানের পদ, যেমন কলকাতা যাদুঘরের অর্থ এবং পাঠাগার কমিটির সদস্য। আলিপুরে যেদিন চিড়িয়াখানা হল, রাজেন্দ্র দু'হাতে দান করলেন অনেক দামী পশুপাখি। তাঁর জীবনচরিতকার জানান যে, তিনিই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন আলিপুরে পশুশালা তৈরীর প্রস্তাব নিয়ে। ঐখানে এখনো রয়েছে 'মল্লিকস্ হাউস', রাজেন্দ্র মল্লিকের স্মৃতি।

রাজেন্দ্র বিয়ে করেছিলেন রূপলাল মল্লিকের মেয়েকে। 'সাত-পুকুর'-এর বিখ্যাত মল্লিকবংশ। মার্বেল প্যালেস তৈরী হওয়ার আগে রূপলাল মল্লিকের ঐ বাড়িটাই ছিল কলকাতায় একটা দেখার মত জিনিস। চোখ ঝলসে যায় তার জৌলুষে। সে-বাড়িতে গান-বাজনা, আমোদ-উৎসব লেগেই আছে। তবে উৎসবের সেরা হল দুর্গাপুজো।

সাহেব-সুবোরাও ছুটে আসে পুজো দেখতে, নাচ-গান শুনতে। তখনকার কলকাতায় ছিলেন একজন পাদ্রী, নাম হেবর। তাঁর লেখা একটা বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী আছে, এতে রূপলাল মল্লিকের ঐ বাড়ি নিয়ে অনেক কথা। অনেকের ধারণা, শ্বশুরবাড়ির এই জেল্লা-জৌলুষটা খুব বড় রকমের ছাপ ফেলেছিল রাজেন্দ্রর মনে। মনে জেগেছিল একটা ঈর্ষা-মেশানো গোপন ইচ্ছা; নিজে যখন বাড়ি করব, সেটা হবে রূপলাল মল্লিকের চেয়ে রূপে-গুণে, হাজার গুণ বেশী। হয়েছিলও তাই।

১৮৬৭। ভারত সরকার রাজেন্দ্রর কপালে পরিয়ে দিলেন একটা উজ্জ্বল টিপ, 'রায় বাহাদুর'। কারণ? কারণ দেশের যাবতীয় জনহিতকর কাজে তার অগ্রণী ভূমিকা। সেবার দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল দেশে। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে কলকাতায় ছুটে এলো দুর্ভিক্ষের-ঘা-খাওয়া মানুষগুলো। কলকাতার ফুটপাতে পা ফেলতে জায়গা নেই। বিশেষ করে উত্তর কলকাতায়। বিপন্ন হয়ে উঠলেন সরকারী মহল। শেষ পর্যন্ত কোনো ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধিতে কলকাতা ধ্বংস না হয়ে যায়। সরকার গড়লেন দুর্ভিক্ষ প্রশমন সমিতি। আদেশজারী হল, এখন থেকে কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আর দরিদ্রদের অন্নদান করতে পারবে না। করতে হবে সরকারের সঙ্গে একযোগে। জনবহুল শহর থেকে দূরে সরকার তাদের জন্যে গড়বে আশ্রয়।

রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ি তখন দরিদ্রদের স্বর্গ। রোজ ৫০০।৬০০ লোক অন্ন পায় সেখানে। এই অবদান শুধু তাঁর জীবিতকালেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মৃত্যুর আগে উইল লিখে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরেও যেন কম করে প্রতিদিন ১০০ জন নিরন্ন 'পক্ক অন্ন' অর্থাৎ রাঁধা খাদ্য পায়। সরকারের আদেশে ক্ষুণ্ণ হলেন অনেকে। রাজেন্দ্র মল্লিকের মত আরো যে সব বড়মানুষ নিজের বাড়িতে অন্নসত্র খুলে-ছিলেন, তাঁরা। হয়তো বড় কারণ একটাই; পুণ্যলাভে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাঁদের। রাজেন্দ্র কিন্তু এগিয়ে এলেন সবার আগে, এবং সম্মত

করলেন অসহযোগীদের। সরকার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্যে গড়বে হাসপাতাল। রাজেন্দ্র ছেড়ে দিলেন নিজের বাগানবাড়ি, অন্যান্য জমি। সরকারের হাতে তুলে দিলেন রোজ একশটা করে টাকা রোজ এক হাজার দরিদ্রকে খাওয়ানোর জন্যে।

বহু বিদেশী পর্যটক কলকাতায় এলে অতিথি হতেন রাজেন্দ্রর বাড়িতে। একবার এসেছিলেন ডক্টর ই এইচ নোলান। নিজের স্মৃতিকথায় এঁকে গেছেন সেই সব দিনের ছবি।

''রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ও আমাকে অতিথি সৎকারে প্রীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজোচিত জমিদারী ও ঐশ্বর্য সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিভিন্ন জিনিস দ্বারা স্বীয় বাসস্থান অলঙ্কৃত করিতেই ব্যস্ত। যে জিনিস যত মূল্যবান, তিনি সেই জিনিসে ততই সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহার গৃহের উদ্যান পশুপক্ষীতে পরিপূর্ণ। এই সংগ্রহের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব দেশের পক্ষী বিদ্যমান। উট-পাখী হইতে এমু এবং চীনের মান্দারিণ হাঁস হইতে বার্ড অব প্যারাডাইসও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় লর্ড ডারবি এই সংগ্রহে কতকগুলি পশুপক্ষী দান করিয়াছিলেন। আমি কাশ্মীর দেশীয় কতকগুলি ছাগল দেখিয়াছি; উহাদের পশমের দ্বারা সুবিখ্যাত শাল তৈয়ার হয়; কিন্তু ছাগলগুলি পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমতল ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বাঁচে না, এইজন্য রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সংগৃহীত দুইশত ছাগলের মধ্যে মাত্র ৫টি জীবিত আছে। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক, এবং সুন্দর ইংরেজী বলিতে পারিতেন। আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসেও তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান বর্তমান। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি তাঁহার বাড়িতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ নাচের মজলিস বসাইয়াছিলেন। বাড়ির মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত করিয়া প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল এবং উহার আলোক, লণ্ঠন ও ঝাড়ে সুশোভিত হইয়া মূল্যবান ফোয়ারা ও রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত হইয়াছিল।'

১৮৭৮-এ বড়লাট লর্ড লিটন তাঁর হাতে পরিয়ে দিলেন একটা প্রকাণ্ড হীরের আংটি। হাতে তুলে দিলেন একটা সনদ। আর মাথায় চাপিয়ে দিলেন বিরাট এক সম্মানের মুকুট, 'রাজা বাহাদুর'।

১৮৮৭ সালে ১৪ই এপ্রিল রাত্রে রাজেন্দ্রর রাজকীয় জীবনের শেষ। এক রাজার মৃত্যুতে আরেক রাজা, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন—

'কলিকাতার দরিদ্র লোকেরা পিতৃহারা হইল বলিলেও চলে।'

রাজা সুখময়

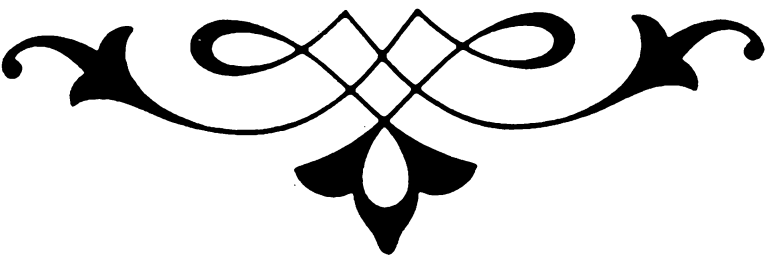

জগৎ শেঠরা ছিলেন মুর্শিদাবাদের ধনকুবের। বারো মাস টাকার খনিতে বাস, সিন্দুক ভর্তি সোনা-দানা, মণি-মাণিক। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার টাকার দরকার পড়লেই দরবারে ডাক পড়তো শেঠেদের। আজ এত টাকা চাই। কাল তত টাকা চাই। কথাটা খসলেই হল মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা এসে হাজির। কলকাতাতেও, সেই সময়ে অমনি এক জগৎ শেঠ ছিলেন যাঁর নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। ডাক নাম নকু ধর। আবার কেউ বলতেন, নকুড় ধর।

তখনো পলাশীর যুদ্ধ হয়নি। ইংরেজরা তখনো শুধুই ব্যবসা-দার। ব্যবসা করতে গেলে মাঝে মাঝেই টান পড়ে তহফিলে। তখন কার কাছে হাত পাতা যায়? অমনি মনে পড়ে যেতো নকু ধরের নাম। নকু ধরের আদি বাস ছিল সপ্তগ্রামে। জোব চার্নকের সময় থেকেই কলকাতাতে বাড়ি-ঘর। ইংরেজদের সঙ্গে খুবই দহরম-মহরম। কারণ, অল্প-স্বল্প হলেও, ইংরেজীটা পারতেন বলতে-কইতে। কী করে

ইংরেজী শিখেছিলেন, সে এক মজার গল্প।

একদিন সকালবেলা গঙ্গা দিয়ে যাচ্ছিল ইংরেজদের একটা মাল-পত্র বোঝাই নৌকো। নৌকো যখন মাঝগঙ্গায়, হয়তো বা উঠেছিল ঘূর্ণী ঝড়। হয়তো নদীর ভিতরকার চোরা ঘূর্ণীটাই টান মেরেছিল নৌকোটাকে। যাই হোক, নৌকোটা গেল ডুবে। নৌকোর মাল-পত্র গেল ভেসে। মাঝি-মাল্লারা যে যার প্রাণ বাঁচাতে সাঁতার দিল পাড়ের দিকে। নৌকোর ইংরেজ যাত্রীরা ডুবে মরল জলে, হাবুডুবু খেতে খেতে। বেঁচে গেল শুধু একজন। তার চেহারাটা ছিল জোয়ান-গোছের। মনের সাহসটাও ছিল ওজনে ভারী।

নকু ধর তখন জপ করছিলেন গঙ্গার ঘাটে বসে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল জলের মধ্যে আধমরা সাহেবের মড়ার মত দেহটা। চাকর-বাকরদের ডেকে তখুনি সাহেবকে জল থেকে তুলে আনা হলো ডাঙায়। তারপর নিয়ে যাওয়া হলো নকু ধরের নতুন বাজারের বাড়িতে। সাত্যিকারের সেবা-যত্ন পেয়ে সে যাত্রা বেঁচে গেল সাহেব। তারপর থেকে নকু ধরের নতুন বাজারের বাড়িতেই সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নকু ধর মোটামুটি শিখে গেলেন ইংরেজীটা। আর তার ফলেই সাহেব-সুবোদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তাটা বেড়ে চলল দিনকে দিন। এইভাবে একদিন হয়ে উঠলেন লর্ড ক্লাইভের মুৎসুদ্দি বা দেওয়ান। সেই থেকে মা-লক্ষ্মীর অফুরন্ত দয়া ঝরতে লাগল তাঁর উপর। দু'হাতে রোজগার। টাকার দরকার পড়লেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকজন ছুটে আসে তাঁর কাছে। তা ছাড়া আছে উঠতে বসতে নানান শলাপরামর্শ। ইংরেজদের কাছে নকু ধরের তখন দারুণ খাতির। রাজা নবকৃষ্ণ তখনো রাজা হননি। বয়েস মোটে ১৮। কাজকর্ম নেই কিছু। সেই সময় ঐ নকু ধরই নবকৃষ্ণকে নিয়ে গেছলেন ক্লাইভের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরী। হেস্টিংসকে ফারসী ভাষা শেখানোর।

এরপর পলাশীর যুদ্ধ। ক্রমশঃ ইংরেজরাই রাজা হয়ে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের। দেশ জুড়ে রোজই বেজে চলেছে যুদ্ধের বাজনা। ক্লাইভের পর কলকাতার গভর্নর হলেন হেস্টিংস। তাঁর আমলেই শুরু হল মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম লড়াই। লড়াই চালাতে গেলে খরচ তো অনেক। নকু ধর অনুমান করে নিলেন নিজের থেকেই যে, এখন বেচারা ইংরেজদের প্রচুর টাকার দরকার, জিততে হলে। না চাইতেই তিনি হেস্টিংস-এর কাছে হাজির হলেন টাকার তোড়া হাতে

নিয়ে। এক-আধটা নয়, ৯০ লক্ষ টাকার তোড়া।

পুরনো কালের কলকাতায় মুখে মুখে ঘুরতো একটা ছড়া।

গোবিন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি
নকু ধরের কড়ি
মথুর সেনের বাড়ি।

বুঝতেই পারছো কত কাহন কড়ি থাকলে এমন সাত কাহন হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তার খবর!

এমন যে মানুষ, একটা গোলাপ ফুলের দশটা পাপড়ির মত দশদিকে যাঁর নাম-যশ, তাঁরও মনে গোলাপের কাঁটার মত সর্বদা বিঁধে আছে একটা গভীর দুঃখ। বিধাতা তাঁকে সব দিয়েছেন, দেননি কেবল একটি পুত্রসন্তান। কন্যাও দিয়েছেন কেবলমাত্র একটি। তার নাম পার্বতী।

একদিন বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে, আলোর রোশনায়ে রাতের কলকাতাকে দিন করে নকু ধরের মেয়ে পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল রঘুনাথের সঙ্গে। রঘুনাথ পাল। তারপর পার্বতীর কোল জুড়ে এল এক ছেলে। তার নাম রাখা হল সুখময়। ফুলের মত টুকটুকে নাতিকে কাছে পেয়ে এতদিনে ছেলের শোকে দিশেহারা নকু ধরের মনে ফিরে এল সুখ, মুখে ফিরে এল হাসি। নাতি-অন্ত প্রাণ দাদু মরবার সময় তাঁর উইলে নিজের অগাধ বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দিয়ে গেলেন সুখময়কেই। সুখময় রাজা হয়ে গেলেন সবদিক থেকেই।

বেশ কিছুকাল আগে হেস্টিংস চেয়েছিলেন নকু ধরকে রাজা উপাধি দিতে। তিনি রাজী হননি। নিজের বদলে তিনি ইশারা-ইঙ্গিত করেছিলেন নাতির দিকে। যদি দিতে হয় ওকেই দিও। রাজকীয় সম্মানের সেই মুকুট একদিন সত্যি সত্যিই পরানো হল সুখময়ের মাথায়। ইংরেজ-রাজাদের ওকালতিতে দিল্লীর দরবার থেকে তাঁর নামে উপাধি এসে পৌঁছল, মহারাজা। সুখময় পাল হয়ে গেলেন

রাজা সুখময় রায় বাহাদুর। সেই সঙ্গে 'চার-হাজারী'-র পদ-মর্যাদা। আর জরির ঝালর দেওয়া পাল্কী চড়ে বেড়ানোর অধিকার। এসব ঘটনা লর্ড মিণ্টোর আমলের।

অবশ্য এই যে এত সম্মান-সমাদর পেলেন, সেটা নিছক বরাত জোরে নয়। পেয়েছিলেন তার দান-ধ্যান, দয়া-দাক্ষিণ্যের গুণে। যেমন মা তেমন হবে তো ছেলে। পার্বতী দেবী, যাকে লোকে ডাকতো মহারাজমাতা বলে, তাঁর ছিল দয়ার প্রাণ। মৃত্যুর পর তাঁর উইল খুলে দেখা গেল, ৪০ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রী ঘাট আর দমদম থেকে ঐ ঘাটে যাওয়ার রাস্তা তৈরির জন্যে।

সুখময় এমনিতে ছিলেন খুব শৌখিন মানুষ। প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজোর সময়ে তাঁর বাড়িতে বসতো নাচ-গানের আসর। তিনদিন ধরে সে সময় বাড়ির সামনে দিয়ে লোকজনের হাঁটা-চলাই হতো দায়। সাহেবরাও ছুটে আসতো মেমসাহেবদের বগলদাবা করে নাচ দেখতে, গান শুনতে, খানা খেতে। গরমের দেশ; বিদেশী অতিথিদের কষ্ট হতে পারে ভেবে টানা-পাখার বাতাস চলতো। অনেকে লিখে গেছেন, কলকাতায় প্রথম টানা-পাখার চলন নাকি এই রাজা সুখময় রায়ের বাড়িতেই।

রাজা সুখময়ের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজটা হল, একটা রাস্তা বানানো। রাস্তা বললে কম বলা হয়। রাজপথ। উলুবেড়িয়া থেকে পুরীর সিংহদ্বার পর্যন্ত। লম্বায় ২৮০ মাইল। যে সময়ের কথা, তখনো রেলগাড়ি দৌড়তে শুরু করেনি আমাদের দেশে। পুরী যেতে হতো সারা পথ পায়ে হেঁটে। রোদ-বৃষ্টি, চোর-ডাকাত, আরো নানান রকম ভয়-ভাবনা মাথায় নিয়ে তীর্থযাত্রীদের ঐ দুঃখ-কষ্টের কথা মনে রেখেই এত বড় লম্বা রাস্তাটা বানিয়েছিলেন তিনি। নাম কটক রোড। শুধু রাস্তা নয়, রাস্তার দু'ধারে ধর্মশালা। ইঁট দিয়ে গড়া। প্রত্যেক ধর্মশালায় দু'খানা করে বড় বড় ঘর, একটা বড় হল ঘর আর বাকি কয়েকটা ঘর খুপরি-খুপরি করে ভাগ করা, যারা এক সঙ্গে থাকতে নারাজ, তাদের জন্যে। বাড়ির সঙ্গে উঠোন। উঠোনের চারপাশে গাছ-গাছালি। উঠোন পেরোলেই পুকুর। পুকুরে ঘাট। প্রত্যেকটা ধর্মশালায় কম করে ৫০০ জন তীর্থযাত্রী থাকতে পারবে, এমনভাবে তৈরি। ধর্মশালা ছাড়া পথের দু'পাশে কূপ তৈরি করে দিয়েছিলেন অজস্র। দু-মাইল, চার-মাইল ছাড়া-ছাড়া। শোনা যায়,

শুধু বালেশ্বর জেলাতেই কূপ খোঁড়া হয়েছিল ৪০টা।

আরও আছে। যেতে যেতে পথের মাঝখানে নদী। নদী পার হবে কিসে? তাই নদীর উপরে ব্রীজ। সেও কি এক-আধটা নাকি? অগুন্তি।

কটক রোড তৈরি হয়ে যাওয়ার পর রাজা সুখময় নিজেই একবার জগন্নাথ দর্শনে বেরুলেন সপরিবারে। সঙ্গে বড়লাট ওয়েলেসলির পাশপোর্ট বা অনুমতিপত্র। সে অনুমতিপত্রে লেখা ছিল কোথাও কেউ যেন তাঁর আসা-যাওয়ার পথে কোনরকম বাধা না দেন বা কর না চান। সেই অনুমতিপত্রে আরও লেখা ছিল রাজার সঙ্গে থাকবে কি কি জিনিস আর সঙ্গী হবে কারা কারা। সেই তালিকাটা পড়লেই সহজে অনুমান করে নিতে পারবে, বিদেশভ্রমণ কী ধরনের কষ্টসাধ্য আর ব্যয়সাধ্য ছিল একসময়ে। তালিকাটার দিকে মন দিয়ে তাকাও এবার। দেখতে পাবে সেই অতীতকালের এক টুকরো ছবিও। তালিকায় ছিল—

রূপোর বাসন, এক দফা।
কাপড়-চোপড় আর পিতলের বাসন, ৪০ বাকসো।
তাঁবু, এক দফা।
খড়খড়ি আছে এমন ঝালর দেওয়া পাল্কী, ১৫টা।
উট, ১টা।
ঘোড়া, অঙ্কটা পড়া যায়নি!
গয়না-গাটি আর অন্যান্য জিনিস, ৪ বাক্স।
খাট, ২ খানা।
মসলা ইত্যাদির বাক্স, ২টা।
বরকন্দাজ, ১৫ জন।
ভৃত্য, ৪ জন।
মশালধারী, ৭ জন।
মুন্সী, ১ জন।
কেরানী, ১ জন।
নাপিত, ৪ জন।
হরকরা, ৪ জন।
ঝাড়ুদার, ১ জন।
সিপাই, ২ জন।
জমাদার, সংখ্যাটা পড়া যায়নি।

এ ছাড়া দান-ধ্যান ছিল আরো। যেমন বৃন্দাবন ধামের কুঞ্জের জন্যে ১৫ হাজার টাকা। আরও একটা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হয়ে। ঐ পদে তিনিই প্রথম বাঙালী। তাঁর দান-ধ্যানের খবর সে সময়ে ভারতবর্ষ ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়েছিল নানাদেশে। পারস্যের শাহরাও তাঁকে উপাধি পাঠিয়েছিল, মহারাজা। আর সে উপাধি মঞ্জুর করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহ।

সুখময় ছিলেন স্যার এলিজা ইম্পের দেওয়ান। এলিজা ভারত-বর্ষে এসেছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়ে, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর হুকুম, তাঁরই কলমে লেখা। ১৮১১-য় পাঁচটি ছেলে রেখে মারা গেলেন মহারাজ সুখময়। বড় ছেলে রামচন্দ্রও উপাধি পেয়েছিলেন মহারাজা। মেজ ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা-বাহাদুর। এর পরের তিন ভাই বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র, নৃসিংহচন্দ্র, রাজাবাহাদুর উপাধি এঁদেরও।

রামচন্দ্র মারা যান সকলের আগে। পালোয়ান হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন তিনি। পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গেছেন এলাহাবাদ আর গয়ায়। পথে চোখে পড়ল যাত্রীদের পথ চলার, নদী পেরোবার কষ্ট। তারপরেই কর্মনাশা নদীর উপর বানিয়ে দিলেন সেতু। ভায়েদের মধ্যে সবচেয়ে নাম-ডাক বা দাপ-দাপট ছিল বৈদ্যনাথের। তখনকার লোকে তাঁকে ডাকত বদনচন্দ্র বলে। যেমন নৃসিংহকে নরসিং। সব ভাইই বাবু-গিরিতে ডাকসাইটে। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গায়ের রঙ আর তেমনিই নবাব-বাদশাদের মত সাজগোজের ঘটা। ইংরেজীতে চটপট কথা-বার্তা। তাই সাহেব-সুবোদের সঙ্গেও ইয়ার-বন্ধুর সম্পর্ক। বৈদ্যনাথের বাগানবাড়িতে মাঝে-মাঝেই বসতো ভোজের উৎসব। একবার নিমন্ত্রণ পেয়ে খেতে এসেছিলেন লর্ড আমহার্স্ট। একা নয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সহ। বৈদ্যনাথের বাগানে মজার জিনিস ঘটতো আরো একটাও। তা হল রামলীলা। পর পর বারো বছর ধরে একটানা চলেছে এই উৎসব। সারা শহর ভেঙে পড়তো সেখানে। বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর রামলীলার মেলা উঠে এল নৃসিংহের বাগানে। বৈদ্যনাথের

সময়ে টিকিটের চল ছিল না। নৃসিংহের সময় চালু হল গাড়ি ঘোড়া ও টিকিট। বৈদ্যনাথের ছিল বাবুগিরি। নৃসিংহের ছিল শখ। একটা আধটা নয়, একশো রকমের। তাঁর বাগানেই পশুশালা। সেখানে হাজার রকমের ফলফুলের গাছ, হরেক রকমের পশুপাখি। আরো কতরকমের শখ!—বুলবুলির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো, নাচ-গান, আমোদ-ফুর্তি, দোল-দুর্গোৎসবের ধুম-ধাড়াক্কা। দিনরাত এই সব অগুনতি আমোদ-ফুর্তির পিছনে টাকার জোগান দিতে গিয়েই এক এক করে বিষয়-সম্পত্তি খোয়াতে লাগলেন নৃসিংহ। সেকালের একটা ছড়ায় টিপ্পনি কাটা হয়েছিল এই জাতীয় উড়নচণ্ডে বাবুদের নিয়ে—

দুর্গা পুজা ঘণ্টা নেড়ে
খোকা হলে বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে
খাঁচায় পুল্লেন কিনা কাক।
বিষয় কর্ম গোল্লায় গেল
লড়িয়ে কেবল বুলবুলি,
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে, হায়!
মারা গেল লোকগুলি॥

বড় হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' বইখানা যখন পড়বে, তখন কলকাতার রামলীলা উৎসব নিয়ে আরও অনেক মজার খবর পাবে। হুতোমের নকশা হল, উনিশ শতকের কলকাতার মহাভারত। সেই অমৃতসমান মহাভারত তোমরা পড়লে নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে কী ভাবে বাবুগিরির ফুটো দিয়ে সোনার কলসির সোনার জল গড়িয়ে চলল ফুরোবার মুখে।

বিসর্জনের পর প্রতিমার গা থেকে যেমন রূপ-রঙ খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিচ্ছিরি খড়ের কাঠামো, সেই রকম হয়ে উঠল একদিন রাজবাড়ির অবস্থা। অনেক পরে, আবার বংশের গৌরব আর সুনাম ফিরে এল, রাজা সুখময়ের বড় ছেলে রামচন্দ্রের প্রপৌত্রের আমলে।

রামচন্দ্রের ছেলে রাজনারায়ণ। মারা গিয়েছিলেন অকালে তাই কোন উপাধি পাননি। রাজনারায়ণের ছেলে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। তাঁরও অকাল-মৃত্যু। তাঁর ছেলে দীনেন্দ্রনারায়ণ। কলকাতার রাস্তা-ঘাটের উন্নতি দরকার। তাই কলকাতা কর্পোরেশনকে একসময় তিনি দান করলেন তিন প্রস্ত জমি—দু প্রস্ত গড়পাড়ে, আর এক প্রস্ত জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ায়। এই দানের বিনিময়ে সম্মানও পেয়েছিলেন তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে—রাজা। উত্তর কলকাতার একটা মস্ত লম্বা রাস্তা আজও শুয়ে আছে তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক

রাজা সুবোধচন্দ্র

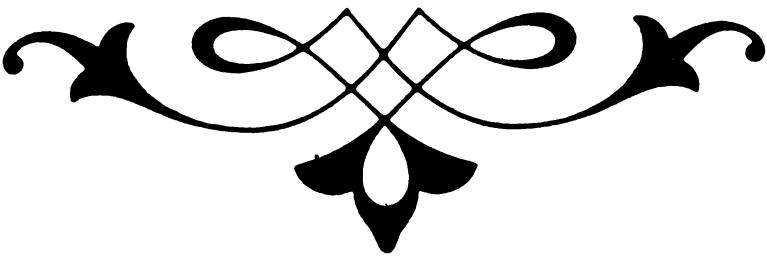

এবার আর এক অদ্ভুত রাজার গল্প। এর আগে যে-সব রাজার গল্প শুনলে, তাঁরা কিন্তু সকলেই ঐ খেতাবটা পেয়েছেন বিদেশী সরকারের কাছ থেকে। এঁর মাথায় কিন্তু রাজসম্মানের মুকুটটা পরিয়ে দিয়েছিল দেশের মানুষ। এমনকি রাজা ছাড়িয়ে মহারাজা পর্যন্ত বলতে চেয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত এক মানুষ, গলায় যাঁর বাঘের ডাক, বক্তৃতায় যাঁর আগুনের ফুলকি, যাঁকে বলা হতো তখনকার মুকুটহীন রাজা, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে রাজার গল্প শুনবে, তাঁর বাবার নাম প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বদিকে তাঁর রাজপ্রাসাদ। বিদ্বান-বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে সমাজে প্রবোধচন্দ্রের খুব নামডাক। কলকাতার যে কোনো বড় সভা-সমিতিতে তাঁর আসা-যাওয়া। রাজভক্ত। কিন্তু প্রয়োজনে রাজদ্রোহী হতেও পিছ-পা নন, এমনি স্বভাবের মানুষ। একবার ঘটেও ছিল তেমন কাণ্ড। কিছুকাল আগে লর্ড নর্থব্রুক চলে গেছেন

ভারত থেকে। ছিলেন গভর্নর জেনারেল। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্যে টাউন হলে ডাকা হয়েছে সভা। কলকাতার মাথা-মাথা মানুষেরা সভায় হাজির। হাজির প্রবোধচন্দ্রও নিজের দুই ভাই মন্মথচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রকে নিয়ে। মন্মথচন্দ্র সবে দেশে ফিরেছেন বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে। তেজস্বী মানুষ। শুরু হয়েছে সভা। সভাপতির আসনে বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড সাহেব। শুরুতেই প্রস্তাব উঠল, গভর্নর জেনারেলের স্মৃতিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কমিটি করা হোক একটা। প্রস্তাবকের গলার আওয়াজ থামতে না থামতেই উঠে দাঁড়ালেন মন্মথচন্দ্র।

—এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার আছে।

গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, তেমনি চমকে উঠল সভায় রাজা-রাজড়া, রাজপুরুষ, জজসাহেব, জমিদারবৃন্দ। হাজার জোড়া চোখ মশালের মত জ্বলে উঠল রাগে। কে এই রাজদ্রোহী? হাজারটা মুখে গর্জন করে উঠল নিমেষে—

—বসুন, বসুন; বসে পড়ুন।

মন্মথচন্দ্র বসে পড়ার মত ভীতু মানুষ নন। টাউন হলের থামের মত সোজা ঘাড়ে দাঁড়িয়েই তিনি জানালেন তাঁর প্রতিবাদ।

—লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের জন্যে এমন কিছুই করেননি যে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে কমিটি করতে হবে।

সভার মানুষ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

—তাহলে ভোট নেওয়া হোক।

ভোট নেওয়া হল। প্রস্তাবের পক্ষে সবাই। বিপক্ষে কেবল দশজন। তার মধ্যে প্রবোধচন্দ্ররা তিন ভাই। হেরে গিয়ে তখুনি সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। দেশনেতা কৃষ্ণচন্দ্র পাল এই দশজনকে সম্মান জানিয়েছিলেন 'ইমমর্টাল টেন' অর্থাৎ 'অমর দশ জন' বলে।

সুবোধচন্দ্র এই রকম সাহসী বাবার ছেলে আর তেজস্বী কাকাদের ভাইপো। অবশ্য মন্মথচন্দ্রের চেয়ে হেমচন্দ্রের ছায়াটাই বেশী ছুঁয়েছিল তাঁর জীবনকে। ন' বছর বয়সে সুবোধচন্দ্র হারান বাবাকে। সেই থেকে হেমচন্দ্রের কাছেই মানুষ। হেমচন্দ্র বড় মজার মানুষ। শৌখিনতায় জুড়ি নেই তখন তাঁর। লোকে বলত, 'ওরিজিনেটর অব দা ফ্যাশন অব দা ডে'। গান-বাজনা, নাটক, অভিনয়ে তুমুল উৎসাহ। তার চেয়ে বেশী উৎসাহ বাড়িতে ভোজসভা বসাতে। চালচলনে পুরোপুরি সাহেব। অথচ ঠাকুর-দেবতার উপরও সমান ভক্তি। তাঁর

আমলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাজবাড়ি দেশ-বিদেশের মান্য-গণ্য মানুষের আসা-যাওয়ার গমগম করতো দিনরাত। আজ লাঞ্চ, কাল ডিনার, পরশু পার্টি। এসেছেনও সব মহা মহা রথী। আগা খাঁ, জাপানের মন্ত্রী কাউণ্ট ওকাহামা, তিলক, গোখলে, বরোদার রাজা, এমনি আরও কতজন। ভালবাসতেন শিল্পকলাও। কিনেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনের একটা বিরাট তৈলচিত্র। দেখবার মতো জিনিস। দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ত সারা শহর। শুধু সাধারণ নাগরিক নয়, হোমরাচোমরা রাজপুরুষরাও ছুটে আসতেন ওয়েলিংটনে, একবার দেখে চোখ জুড়োত। ছবিটা এঁকেছিলেন গিলবার্ট স্টুয়ার্ট নামে আমেরিকার একজন বিখ্যাত শিল্পী। কলকাতার নামজাদা ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকারকে আমেরিকার ব্যবসায়ীরা উপহার দিয়েছিল ছবিটা। সেখান থেকেই ছবিটা চলে আসে হেমচন্দ্রের হাতে। পরে আমেরিকান সরকার ছবিটি কিনতে চেয়েছিলেন দু'লক্ষ টাকা দিয়ে। হেমচন্দ্র নারাজ।

এই রকম মানুষও সাহেবিআনার খোলস ছিঁড়ে ফেললেন এক-দিন গা থেকে। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন বালগঙ্গাধর তিলক। কলকাতায় হেমচন্দ্রের চোখে ঘুম নেই। বন্ধুকে বাঁচানোর জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে চলেছেন, তিলককে বাঁচানোর টাকা তুলতে। পিছনে উৎসাহদাতা দুজন বিখ্যাত মানুষ, রবীন্দ্রনাথ আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুবোধচন্দ্রের মানুষ হওয়ার হাতেখড়ি এই হেম-কাকার হাতেই। কলকাতায় যতদূর পড়ার পড়ে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে কেম্ব্রিজ, সিনিয়র কেম্ব্রিজ শেষ করে ব্যারিস্টারি। পড়তে পড়তেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন একবার। সাংসারিক কোন ঝামেলায় জড়িয়ে আর ফিরে যাওয়া হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই দুই কাকার আদলে, আদব-কায়দায়, মনে-মেজাজে সাহেব। সাহেব-সুবোদের সঙ্গেই ভাব-ভালবাসা, ওঠা-বসা, আমোদ-ফুর্তি বেশী। হেম-কাকার মতই বাড়িতে ঘন ঘন ভোজসভা। ওদিকে

আবার নাটকের ক্লাব এমনকি অভিনয়ের দিকেও আঁতের টান। এই-ভাবে আর দশটা বড়লোকের ছেলের মতই ঝকমকে-তকতকে পাথরের মেঝেয় মার্বেলের বলের মত তরতরিয়ে গড়িয়ে চলেছিল সুবোধ-চন্দ্রের সুখের জীবন। হঠাৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেল সব। হঠাৎ বাংলাদেশের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এক আগুনের ঝড়।

১৯০৫। লর্ড কার্জনের কূট চক্রান্তে দু-টুকরো হয়ে গেল বাংলাদেশ। সারা দেশ গর্জন করে উঠলো প্রতিবাদে! দেশে-দেশে ঘরে-ঘরে জন্ম নিতে লাগল অন্য একধরনের মানুষ। তার নাম দেশপ্রেমিক। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যখন জ্বলে উঠেছে লাল রঙের উদ্দীপনা, দেশের নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দেশের ছাত্রসমাজ, সেই সময়ে সরকারী শিক্ষা বিভাগের হর্তা-কর্তা কার্লাইল সাহেব জারী করলেন এক সার্কুলার। ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া, বন্দেমাতরম্ বলা, অতঃপর বারণ। যদি কেউ এই আইন না মানে, তাকে বিতাড়িত করা হবে স্কুল-কলেজ থেকে। এই সার্কুলারের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠল দেশের মানুষ। প্রতিবাদের বিরাট জনসভা ডাকা হল পাল্তির মাঠে। এর আরও একটা নাম ছিল, ফিল্ড এ্যান্ড এ্যাকাডেমি-র মাঠ। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের হোস্টেল, ঐখানেই ছিল একটা প্রকাণ্ড খেলা-ধূলোর মাঠ। তারই গায়ে মহেন্দ্রনারায়ণ দাসের বাড়ি। সেই বাড়ি ভাড়া নিয়েই সুবোধচন্দ্র গড়েছিলেন 'ফিল্ড এ্যান্ড এ্যাকাডেমি' নামের ক্লাব।

সেদিনের প্রতিবাদ-সভায় হাজার হাজার মানুষের সামনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সরকার যদি স্বদেশী আন্দোলনকে নষ্ট করার জন্যে ছাত্রদের উপর এই রকম জুলুম জারী করতে থাকেন, তাহলে আমরাও এর প্রতিকারের জন্যে গড়ে তুলবো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

এর ক'দিন পরে আবার এক জনসভা। সেখানে সভাপতির আসনে রবীন্দ্রনাথ। তিনিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পক্ষে। বার-বার কথাটা কানে এসে বাজছিল সুবোধচন্দ্রের। মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল স্বদেশের জন্যে নানা ভাবনা। সেই সময় নিজের ক্লাবঘরে বসে তখনকার বিপ্লবী নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদিন বলে ফেললেন,

—ছেলেদের জাতীয় শিক্ষা দেবার জন্যে আপনারা যদি সত্যি সত্যিই কলেজ খোলেন, আমি এক লক্ষ টাকা দিতে পারি।

শুনে লাফিয়ে উঠলেন উল্লাসে, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। সেইদিন বিকেলেই তখনকার বিপ্লবী নায়ক কৃষ্ণকুমার মিত্র-র বাড়িতে নেতাদের মিটিং। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মিটিং-এ এসেই সুবোধচন্দ্রের প্রস্তাবটা শুনিয়ে দিলেন সবাইকে। মিটিং-এ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি তো কথাটা শুনেই ফেটে পড়লেন আনন্দে।

—বলেন কি? সুবোধ বলেছে এই কথা?

সুবোধচন্দ্র আর চিত্তরঞ্জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আর থাকতে পারলেন না। সভার কাজ ফেলে রেখে ছুটলেন সুবোধচন্দ্রের বাড়িতে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। আলোচনা চলল দু'ঘণ্টা ধরে।

পরের দিনই পান্তির মাঠে আবার এক বিরাট জনসভা। সকলের অনুরোধে সভাপতির আসনে বসতে হল সুবোধচন্দ্রকে। দেশবন্ধু প্রস্তাব করলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। সমর্থন জানালেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে সুবোধচন্দ্র ঘোষণা করলেন —জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি এক্ষুনি এক লক্ষ টাকা দান করতে ইচ্ছুক।

জনসভা হয়ে উঠল উল্লাস-ধ্বনির সমুদ্র। করতালি যেন থামতে চায় না। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মঞ্চে উঠে সুবোধচন্দ্রের মাথায় পরিয়ে দিলেন 'রাজা' উপাধির মুকুট। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেশবন্ধু, বিপিন পালের মত নেতারাও একে একে সুবোধচন্দ্রকে সম্ভাষণ জানালেন রাজা বলে।

সভা শেষ হল। সুবোধচন্দ্র ফিরে যাবেন তাঁর বাড়িতে। গাড়িতে উঠতে যাবেন। এমন সময় হাজার দশেক ছেলে এসে ঘিরে ফেলল সেই গাড়ি। গাড়ি থেকে খুলে দিল ঘোড়ার বাঁধন। এতদিন তারা যে-গলায় সমুদ্রের গর্জন তুলে বলেছিল 'বন্দেমাতরম্', এখন সেই গলায় বেজে উঠল আকাশ-মাটি কাঁপানো ঝড়, রাজা সুবোধচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি। গাড়িটাকে টানতে টানতে তারাই চলল সুবোধচন্দ্রকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে।

এর তিনদিন বাদে শিমুলতলা থেকে কলকাতায় ফিরছেন

সুরেন্দ্রনাথ। ভাঙা-শরীটাকে সুস্থ করতে গিয়েছিলেন সেখানে। বেলা দশটায় হাওড়া স্টেশনে পেঁাছে দেখেন হাজার হাজার মানুষ। হাতে ফুলের মালা। গলায় বন্দে মাতরম্। মুখে-চোখে কিসের যেন লাল আভা। বাইরে অপেক্ষা করছিল ফুলে ফুলে সাজানো গাড়ি। সেই গাড়িতে সুরেন্দ্রনাথকে চাপিয়ে জনস্রোত এগিয়ে চলল হ্যারিসন রোড-এর দিকে। গোলদিঘির কাছে এসে, যার সামনেই সেনেট হল, থামল শোভাযাত্রা। এবার সেই হাজার হাজার গলায় বেজে উঠল অন্য ধ্বনি, সুরেন্দ্রনাথকে শুনিয়ে। হয়তো বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইট-পাথরকেও।

—আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই।

সুরেন্দ্রনাথ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গাড়ির উপর। বাতাসে আছড়ে পড়ল তাঁর বজ্রকণ্ঠ।

—সেদিন আপনাদের যে বিরাট সভা হয়েছিল, আমি শুনলাম তাতে আমার তরুণ বন্ধু বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক...

আর বলতে হল না। সভার মানুষ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গর্জন করে উঠল,

—বলুন রাজা সুবোধচন্দ্র...

সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মিতার রাজা। তিনিও জানেন কেমন করে জয় করতে হয় জনতার মন। বলে উঠলেন,

—রাজা নয়, আমি বলি মহারাজ, সুবোধচন্দ্র আপনাদের ১ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে সকলের মনে এমন উৎসাহ সঞ্চার করতে পেরেছেন বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে...

এর পুনরাবৃত্তি আবার কিছুদিন পরের আর এক জনসভায়। সেখানে বক্তৃতা করতে উঠে বিপিন পাল সুবোধচন্দ্র সম্বন্ধে বললেন,

—আমরা যাঁর প্রজা সেই রাজা সুবোধচন্দ্র...

সুবোধচন্দ্রের এই লক্ষ টাকা থেকে সত্যিই তৈরী হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পরে আরও অনেক রাজা-মহারাজা এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। যেমন গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী দিলেন ৫ লক্ষ টাকা। ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য ২৷৷ লক্ষ টাকা। ১০ হাজার, ২০ হাজারের তো কথাই নেই। তারপর সত্যি সত্যিই তৈরী হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "অনেকদিন পরে আজ

বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল।"

আরম্ভ হল বৌবাজারের ভাড়াটে বাড়িতে। বরোদা থেকে ৭৫০ টাকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দ চলে এলেন কলকাতায় এর অধ্যক্ষ হতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 'ডন' সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়। সখারাম গনেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর মত পণ্ডিত মানুষেরা স্বেচ্ছায়-সদিচ্ছায় জড়িয়ে গেলেন এখানে শিক্ষকতার সূত্রে। সাহিত্য নিয়ে আলোচনার দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচ্য শিল্পকলা, আনন্দ কুমারস্বামী। অঙ্ক, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনিষদ, হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত।

এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক। সুবোধচন্দ্রের রাজা হওয়ার কাহিনী এইখানেই শেষ। মনে হতে পারে, এরপর তিনি মনের সুখে ডুবে রইলেন নিজের বিলাসিতার জীবনে। আগের মত সাহেবিআনায়, আমোদ-উৎসবে। সেটা হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু যা ঘটল, তা এর উল্টোটাই। আগে হলেন রাজা, তারপর রাজদ্রোহী।

রাজনীতির ব্যাপারে যাঁরা উগ্রপন্থী, তাঁদের মুখপাত্র হয়ে একটা নতুন কাগজ বের করা হবে। 'বন্দেমাতরম্'। প্রধান উৎসাহদাতা কে? সুবোধচন্দ্র। তিনিই ম্যানেজিং ডাইরেকটর। অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদক। ঘরে নিজের স্ত্রী প্রকাশিনী দেবী মৃত্যুশয্যায়। সুবোধচন্দ্র কোথায়? তিনি বন্দেমাতরম্ আপিসে রাত একটা দুটো পর্যন্ত জেগে লিখে চলেছেন সম্পাদকীয়। বন্দেমাতরম্-এর আগুন-জ্বালানো লেখার জন্যে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করল অরবিন্দকে। জামিন হবে কে? সুবোধচন্দ্রের ভাই নীরদচন্দ্র। তখন বন্দেমাতরম্ আপিসে খানা-তল্লাসী হওয়াটা নিত্যদিনের ব্যাপার। এই সব উত্তেজনাময় ঝামেলা পোয়াতে ক্লান্ত হয়ে কিছুদিন বিশ্রামের হাওয়া গায়ে লাগাতে চলে গেলেন কাশীতে। তখন শুরু হল সুবোধচন্দ্রের বাড়িতেও খানা-তল্লাসী। তাতেও সাধ মিটল না সরকারী গোয়েন্দাদের। বাজেয়াপ্ত

করা হল বন্দেমাতরম্-এর ছাপাখানা। কাশী থেকে গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। নজরবন্দী করে রাখা হল আলমোরায়। তবে ইংরেজ সরকার খুব দয়ালু। তাই সুবোধচন্দ্রের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তাঁর এক প্রিয় খানসামাকে। ১৪ মাস পরে হাজত থেকে আবার খোলা পৃথিবীর আলো-বাতাসে। এরপর রাজনীতির সঙ্গেই মন দিলেন দেশের সংগঠনমূলক কাজের দিকে, খুললেন 'লাইট অফ্ এশিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড'। যাদবপুরে গাঁথা হল 'কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনলজি'-এর ভিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন আলাদা করে টাকার তোড়া, যা থেকে প্রতি বছর দেওয়া হবে দুটি বিশেষ বৃত্তি। বাবার নামে, প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক বৃত্তি। কাকার নামে হেমচন্দ্র বসু মল্লিক বৃত্তি। এই টাকায় প্রত্যেক বছর একজন করে অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে, যাঁর কাজ হবে সাহিত্য অথবা বিজ্ঞান অথবা দর্শন নিয়ে নতুন গবেষণা।

আগুনে কি না গলে। কঠিন লোহা, সেও গলে জল। দেশপ্রেমের আগুনও তেমনি গলায় মানুষের স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা, শুধু-মাত্র নিজের বাঁচার আমোদ-উদ্দীপনা। রাজসুখে যাঁর জীবন কাটানোর কথা, সেই সুবোধচন্দ্র গলতে গলতে যেন নেমে এসেছেন রাজপথের ধুলোয়-পাথরে। যৌবনে যে-মানুষটার কত নিবিড় ভাল-বাসাবাসির সম্পর্ক ইংরেজদের সঙ্গে, এখন সেই ইংরেজদের নাম শুনলে গায়ে জ্বর কিংবা হাতে-পায়ে জ্বালা। একটা গল্প শুনলে বুঝতে পারবে, কী প্রচণ্ড ঘৃণার পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছিল তাঁর ভিতরে ইংরেজ রাজপুরুষদের সম্পর্কে।

বসু-মল্লিক পরিবারে জর্জ ওয়াশিংটনের একটা দামী তৈলচিত্র ছিল এবং সেটা দেখবার জন্যে দেশের মানুষ আর বিদেশের সাহেব-সুবোরা ছুটে আসতো, সেকথা আগেই শুনেছো। সুবোধচন্দ্রের আমলেও তেমনি ভিড় লেগে থাকতো প্রায়ই। বাংলার ছোটলাট তখন স্যার এণ্ড্রুল ফ্রেজার। তিনি একবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, দেখতে যাবেন ছবিটা। মহামান্য লাটসাহেব আসছেন শুনে যে-ঘরে ছবি সে-ঘরের দরজাটা খোলা রাখার হুকুম দিয়ে নিজে গা-ঢাকা দিলেন পাশের এক বাড়িতে। ভাই নীরদচন্দ্রের উপর ভার দিলেন লাট-সাহেবকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন জানানোর। লাটসাহেব এলেন, দেখলেন, খুশী হলেন, চলে গেলেন। গৃহস্বামী অর্থাৎ সুবোধচন্দ্রের

অনুপস্থিতিটা তাঁর যে চোখে পড়েনি, তা নয়। কিন্তু মুখে সেটা নিয়ে কিছু প্রকাশ করলেন না। মুখ হাঁড়ি আর চোখ ছানা-বড়া হয়ে গেল তাঁদের যাঁরা সরকারের জো-হুজুর। পরে সুবোধচন্দ্রকে কাছে পেয়ে তারা চোখের ভুরুকে ধনুক বানিয়ে যখন জিগ্যেস করলে, অমন পালিয়ে থাকার কারণটা কি, সুবোধচন্দ্রের অকপট উত্তর,

—লাটসাহেব তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। খুব সাধারণভাবেও আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাননি। তিনি এসেছিলেন রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে শুধু ছবিটাই দেখতে। দেখার আয়োজন করে দিয়েছি। আমি সামান্য মানুষ। মাথা নীচু করে যেচে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো কেন?

রাজপুত্রের মত রূপ। মুখে সকাল-সন্ধে মিষ্টি অমায়িক হাসি। দীর্ঘ আঁটোসাঁটো শরীর। বিছানায় শুইয়ে রাখার মত অসুখ-বিসুখ কখনো ছুঁতে পারেনি তাঁকে। বিয়ে করেছিলেন দু'বার। প্রথম স্ত্রী প্রকাশিনী চারটি কন্যার জন্ম দিয়ে মারা যাওয়ার পর, দ্বিতীয় স্ত্রী কমলপ্রভা। তিনিও স্বামীকে উপহার দিয়েছিলেন ৩টি ছেলে ও ২টি মেয়ে।

স্বদেশী আন্দোলনের ঝড়-ঝাপটায় মরচে পড়েছিল শরীরের ভিতরে। কিছুদিন বিশ্রামের জন্যে চলে এসেছিলেন দেওঘরে। সেখান থেকে জসিডি। দু'দিন যেতে না যেতেই সাঁওতাল পরগণার সাধারণ মানুষ পেয়ে গেল মানুষের গড়নে এক দেবতাকে। তাদের জন্যে সুবোধচন্দ্রের হোমিওপ্যাথির বাক্স দিনরাত খোলা। সেখান থেকে দার্জিলিং। হঠাৎ একদিন বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে টাইফয়েড। সে অসুখ আর সারল না। ১৯২০, ১৩ নভেম্বর। দার্জিলিং থেকে দৌড়ে এল এক শোকসংবাদ কলকাতায়। তারপর কাগজে কাগজে, মাঠে-জনসভায় হাজার হাজার মানুষের চোখে জল, বুকে হাহাকার। কারও কারও মনে হল, তারা সর্বস্বান্ত।

Collect More Books >
From Here

যে কলকাতাকে আমরা
অনেকদিন আগে পিছনে ফেলে
এসেছি, তার ভিতর থেকে
বেছে-নেওয়া ৬টি চরিত্রকে নিয়ে
এই বই। এঁদের মধ্যে
৫ জন হলেন রাজা। আর
একজন হলেন রাজকুমার।
পূর্ণেন্দু পত্রীর কলমে
ইতিহাসের বাসি গল্প হয়ে
উঠেছে ফুলের মতো তাজা।
বাংলা শিশু-সাহিত্যের
অল্প যে-ক'টি বইকে আমরা
বলতে পারি—'অপূর্ব',
এ-বই তাদের মধ্যে অন্যতম।